সাচ্চা দরবার

অবধূত

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

শ্রীমতী গীতা ভৌমিক
কল্যাণীয়াসু

....

SACHCHA DARBAR

a novel by

Abadhut

Published by Mitra & Ghosh
10 S. C. De St., Calcutta 12

Price : Rs. 2/-

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও বিদ্যুৎ প্রিন্টিং প্রেস,
১৭ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

দু টাকা

সাঙ্চা দরবার

॥ ১ ॥

শ্রীচৌহান চলেছেন সাচ্চা দরবারে।

ওঁর সঙ্গে চলেছে মাকড়া বোলতা বৈতাল কুলতিলক আর ল্যালা।

ল্যালা গেলেই লয়লা যাবে। আর লয়লা গেলেই লয়লার মা যোগিয়া যাবে।

তা'হলে মোট যাচ্ছে সাতজন, শ্রীচৌহানকে নিয়ে আট।

তোড়জোড় চলছে এক মাস ধরে, আকাশে মেঘ জমতে শুরু করলেই তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়।

তারপর বৃষ্টি নামে, লাইনের দু'পাশে জল জমে, খানাখন্দ বোঝাই হয়ে যায়।

মাসখানেক বৃষ্টি চলবার পরে কুলতিলককে পাঠান শ্রীচৌহান সংবাদ নেবার জন্যে। সাচ্চা দরবারে হাজির হয়ে কুলতিলক শ্রীচৌহানের পুরোহিত সন্তর্পণ ঠাকুরের খোঁজ করেন।

হ্যাঁ, ঠাকুর মশাই বাহাল তবিয়তে আছেন, একটু মোটা হয়েছেন, একটু ভুঁড়ি বেড়েছে, আর বাঁ পায়ের সেই গোদটার ওপর দগদগে ঘা হয়েছে।

তা হোক গে, অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি হবে না

শ্রীচৌহানের। অতি পয়মন্ত যজমান, সন্তর্পণ ঠাকুরের কপাল খুলে গেছে শ্রীচৌহানকে পেয়ে।

সাচ্চা দরবারে খানদশেক কোটরওয়ালা একখানা খোলার চালের বাড়ি ভাগ্নের জন্যে রেখে দিয়ে সন্তর্পণ ঠাকুরের মামা স্বস্ত্যয়ন ঠাকুর যেদিন বাবার চরণে স্থান পেলেন সেদিন সন্তর্পণ স্টেশনে গিয়ে রেলের বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতি গাড়ি থেকে যাত্রী পাকড়াও করতেন।

মামার সেই কোটরগুলোর প্রতিটি আট আনা হিসেবে ভাড়া হোত। রাত্রে যদি কেউ থাকত তাহলে দিত এক টাকা।

রাত্রে তখন কেউ থাকত না সাচ্চা দরবারে। যারা ধন্না দিত তাদের সঙ্গের লোক এক-আধজন থাকত।

সন্তর্পণ ঠাকুর ধন্না দেওয়ার যাত্রী পেতেন না। বাঘা বাঘা পুরোহিতরা দখল করত তাদের। ঘর ভাড়া দিয়ে সন্তর্পণ তখন দিনে হু'টো টাকারও মুখ দেখতে পেতেন না।

এহেন যখন হাল তখন বাবার কৃপা হল ঠাকুরের ওপর।

ঘোরতর বর্ষা, সাচ্চা দরবারের পথগুলো সব পচা নর্দমায় পরিণত হয়েছে। সকালবেলার হুখানা গাড়িতে যত যাত্রী এসেছিল হুপুরের, গাড়িতে তারা ঝেঁটিয়ে বিদেয় হয়েছে।

সেদিন আর পয়সার মুখ দেখার সম্ভাবনা নেই দেখে ঠাকুর মশাইরা যে যার ঘরে চলে গেছেন।

সন্তর্পণ বাড়ি থেকে খেয়ে এসে বিশ্রাম করছেন যাত্রী-ওঠা বাড়িতে। একটা কোটরের ভিতর মাত্বর পেতে শুয়েছেন তিনি। থাঁত্ব মানে ঐবাড়ির ঝি তাঁর চরণে ত্যাল দিয়েদিচ্ছে।

হেনকালে বাইরে ডাক শোনা গেল। কাপড়-চোপড় সামলে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর।

আর অমনি বাবার কৃপায় কপাল ফিরতে শুরু হল।

শ্রীচৌহান খপ করে ঠাকুরের হাতে একগোছা নোট গুঁজে দিয়ে বিপদটা বাতলালেন। ঠাকুর সেটা বাতলালেন থাঁত্বকে।

আধ ঘণ্টার ভেতর প্রায় অচৈতন্য একটা দশ-এগার বছরের মেয়েকে নিয়ে এসে তুখানা কোটর দখল করে বসলেন ওঁরা।

সন্তর্পণ রটিয়ে দিলেন, এক শেঠজী এসেছেন তাঁর সঙ্গে রুগ্না মেয়ে নিয়ে, বাবার কৃপায় মেয়ে সারবে তবে শেঠজী যাবেন।

খেঁকীকুত্তার মত থাঁত্ব লোক তাড়াতে লাগল, কাউকে শেঠজীদের কাছে ঘেঁষতে দিল না।

রক্তমাখা ন্যাকড়াকানি সব সামলাতে লাগল থাঁত্ব, দেখতে দেখতে মেয়ে সেরে উঠল।

আটদিনের দিন শ্রীচৌহান বিদায় হলেন সাচ্চা দরবার থেকে।

থাঁত্বর তুই কনুইয়ে তু'গাছা মোটা মোটা অনন্ত শোভা

পেতে লাগল। আর সন্তর্পণ ঠাকুর খোলার চাল বজায় রেখে দেওয়ালগুলো পাকা করে মায় উঠোন সারাবাড়ির মেঝে সিমেণ্ট করে ফেললেন।

তারপর আর দেখতে হল না। শ্রীচৌহানের সমাজে রটে গেল সন্তর্পণ ঠাকুরের নাম।

বড়ই বিশ্বাসী মানুষ সন্তর্পণ, বেমক্কা কোনও ফ্যাসাদে পড়ে গেলে ঠাকুর উদ্ধার করে দেন।

তাছাড়া খাঁতুর নামটিও বিশেষভাবে রটে গেল। এন্তার বোনঝি আর ভাইঝি আছে খাঁতুর, কালো কুচকুচে নধর কচি দেহাতি মাল, আট থেকে আটচল্লিশ যা চাও পাবে।

বর্ষা পড়লেই খাঁতু নিয়ে আসে সবাইকে সাচ্চা দরবারের মেলা দেখাতে, মেলার পর তারা গাঁয়ে-ঘরে ফিরে যায়। নিয়ে যায় সঙ্গে করে আধুনিক ফ্যাশানের জুতো-জামা-কাপড়, গিলটি-করা গহনা আর ঘা।

হ্যাঁ, ঐ আর এক বিপত্তি। কচি কচি মেয়েগুলো ঘা নিয়ে ঘরে ফেরে। অবশ্য সাচ্চা দরবারের কৃপায় সে ঘা বয়েস হলে চাপা পড়ে যায়।

কি করা যাবে, শ্রীচৌহানের সমাজে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে একটি বা দুটি কালো কুচকুচে আট-ন-দশ বছরের মেয়ে পেলে নিজের শরীরের বিষটা নামিয়ে ফেলা যায়। ঐ বিষ নামাতে গিয়েই না প্রথমবার শ্রীচৌহান বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন!

সে-বছর অবশ্য সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি যোগিয়াকে আর যোগিয়ার ন' বছরের মেয়ে লয়লাকে। উঠেছিলেন বাজারে গুঞ্জরি বাড়িউলীর ঘরে।

সাচ্চা দরবারের কৃপায় সবই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হল। মেয়ের মুখ চেপে ধরে রইল যোগিয়া, শ্রীচৌহান তাঁর শরীরের বিষ নামালেন।

কিন্তু তারপর সামলানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা বেহুঁশ হয়ে পড়ল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তখন যোগিয়ার জামাকাপড় পর্যন্ত, মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে যোগিয়া পাগল হয়ে উঠল।

যাই হোক, কেলেঙ্কারি করেনি যোগিয়া।

তারপর তো সন্তর্পণ ঠাকুর শ্রীচৌহানের সম্মান রক্ষা করলেন।

সেই থেকে শ্রীচৌহান এবং তাঁর সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সন্তর্পণ ঠাকুরের সম্মান রক্ষা করছেন।

ওঁর নিজের থাকবার বাড়ি দোতলা হয়েছে। যাত্রী-ওঠা বাড়ি তিনতলা হয়ে গেছে।

তবে খানতিনেক খোলার চালের ঘর রাখতে হয়েছে ঠাকুরকে তিনতলার পেছন দিকে।

বছর বছর মেলার সময় থাঁতু তার দেশ থেকে গণ্ডা গণ্ডা ভাইঝি বোনঝি আনে কিনা। তাদের রাখবে কোথায়! থাঁতুর জন্যেই সন্তর্পণ খোলার চালের ঘর কখানা বজায় রেখেছেন।

কুলতিলক এক রাত থেকে সব দেখেশুনে গেলেন। থাঁতু দেখাল গুটিপাঁচেক কচি মাল, পাকা ঝানু মেয়ে সব কটি, কি জন্যে এসেছে ভাল করে জানে।

আলতা পরছে, পাতা কেটে চুল বাঁধছে, রঙিন ডুরে শাড়ি পরে তৈরী হয়ে রয়েছে, মেলা জমলেই হয়।

ছোট ছোট গামছা পরিয়ে সব কটিকে কুলতিলকের সঙ্গে ঘরে বন্ধ করলে থাঁতু, নিজে উপস্থিত থেকে নানারকম পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিলে যে সব কটি আনকোরা।

সন্তুষ্ট হয়ে কুলতিলক কিছু দাদন দিয়ে ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে শ্রীচৌহানকে নিশ্চিন্ত করলেন শুভ সংবাদ দিয়ে : শ্রীচৌহান তৈরী হলেন। বেশী দেরি করা ঠিক নয়। মেলার প্রথম দিকে না গেলে মাল সব ঝুটা হয়ে যেতে পারে।

লয়লা এখন সেয়ানা হয়েছে। যোগিয়া ফুলতে ফুলতে এমন বেঢপ হয়ে উঠেছে যে শ্রীচৌহান তাকে স্পর্শ করেন না।

ভাগ্যে মেয়েটা তাড়াতাড়ি সেয়ানা হয়ে উঠল নয়ত যোগিয়াকে পথে দাঁড়াতে হোত।

ওরা মা-মেয়ে দু'জনেই যাবে শ্রীচৌহানের সঙ্গে, ফি বছর যায়।

হাতের কাছে যোগিয়া না থাকলে ওঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। যোগিয়া জানে শ্রীচৌহানকে, ষোল বছর বয়েস যখন ওঁর, তখন থেকে যোগিয়া ওঁকে সেবা করছে।

আজ না-হয় বেঢপ হয়ে উঠেছে নিজে, কিন্তু ছুকরী-গুলোকে তালিম দেবে কে!

তাদের তালিম দিতে হবে, ল্যালার ওপর নজর রাখতে হবে; বিটকেল শখ চাপে কিনা শ্রীচৌহানের মগজে, ল্যালাকে লেলিয়ে দিয়ে তিনি খেল্ দেখতে ভালবাসেন।

ল্যালা কুকুরের মত জিভ দিয়ে চাটে। চাটতে চাটতে কামড়ে বসল হয়তো। যাকে কামড়ালো সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, দেখে শ্রীচৌহান পরমানন্দ লাভ করলেন।

ঐ সব বিটকেল শখের জন্যেই ল্যালাকে পুষছেন শ্রীচৌহান।

ভাল ভাল সাজপোশাক পরিয়ে সভ্য করে তুলেছেন ল্যালাকে।

পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ওকে, একদম উলঙ্গ সাজোয়ান এক ছোকরা আঁস্তাকুড় হাতড়ে কি যেন খাচ্ছিল। ধরে নিয়ে এলেন তাকে শ্রীচৌহান, স্নান করিয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে ঘরে বন্ধ করলেন।

পাঁঠার মত চিৎকার করত তখন ল্যালা, একদম কথা বলতে পারত না। তারপর ল্যালার আসল গুণটি টের পেলেন শ্রীচৌহান।

বেশ বড় একটা দোঁ-আশলা কুত্তী ছিল শ্রীচৌহানের।

কুত্তীটা পরিত্রাহি চিৎকার করছে কেন দেখতে গেলেন শ্রীচৌহান একদিন রাত্রে।

দেখলেন, ল্যালা তাকে পাকড়াও করেছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে উনি দেখলেন, ল্যালার কাণ্ডকারখানা। তারপর থেকে ল্যালার কদর বাড়ল। যোগিয়ার ঘরে ল্যালাকে আনতে শুরু করলেন।

যোগিয়া থাকবে, যোগিয়ার মেয়ে লয়লা থাকবে আর ল্যালাও থাকবে এক ঘরে।

মানতে হোল মেয়েকে শ্রীচৌহানের আবদার। এখন অবশ্য লয়লা ল্যালাকে পছন্দ করে। সময় নেই অসময় নেই ল্যালাকে নিয়ে ঘরে দরজা দেয়।

শ্রীচৌহানের তাতে আপত্তি নেই, কারণ একমাত্র চাটা ছাড়া ল্যালা আর কিছু করতেই জানে না।

মাকড়া বৈতাল আর বোলতাও যাবে শ্রীচৌহানের সঙ্গে। ওরা যাবেই। শ্রীচৌহান যখন শেয়ার মার্কেটে যান ওরা সঙ্গে থাকে।

শ্রীচৌহান যখন রেস গ্রাউণ্ডে যান ওঁরা ওর কাছছাড়া হয় না। শ্রীচৌহান যখন সেবা সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করতে যান, ওরা তিনজন সভাপতির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে।

খবরের কাগজে শ্রীচৌহানের যে সব ছবি ছাপা হয় সেই সব ছবিতে মাকড়া বৈতাল আর বোলতার ছবিও উঠে যায়।

সেবার শেঠানীকে নিয়ে শ্রীচৌহান বদরীনারায়ণ কেদারনাথ দর্শন করে এলেন।

হরিদ্বারের সাধুরা মস্ত সভা করে শ্রীচৌহানকে ধর্মরক্ষক উপাধি দান করেন।

দিল্লীর বড় বড় পত্রিকায় ছবিসুদ্ধ সেই সভার বিবরণ ছাপা হয়েছিল। সেই ছবিতেও বোলতা মাকড়া আর বৈতালকে চেনা যাবে।

একটা মানুষের জানের দাম আছে, মানের ভি আছে।

মাকড়া বৈতাল আর বোলতার জিম্মায় শ্রীচৌহানের জান মান ইজ্জৎ সব কিছু সমর্পিতং।

ওরা সঙ্গে না গেলে যাবে কে?

কুলতিলক যান শ্রীচৌহানের সঙ্গে ওঁর ধর্মরক্ষা করতে। মানে কুলতিলক হচ্ছেন শ্রীচৌহানের কুলপুরোহিত।

উনি শ্রীচৌহানের সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে বা রেস গ্রাউণ্ডে বা কোনও সভা সমিতিতে যান না। যান তীর্থস্থানে। যেখানে শ্রীচৌহান দানধ্যান করেন।

কুলতিলক শ্রীচৌহানের ঐ দানধ্যানের দিকটা সামলান। কুলপুরোহিত হিসেবে যজমানের ইহলৌকিক পারলৌকিক সর্ববিধ মঙ্গল অমঙ্গলের দায় তাঁর।

অতএব কুলতিলক তো যাবেনই।

বিদ্যাসাগর মশায়ের ভাষায় "প্রস্থান সময় উপস্থিত হইল"।

সাচ্চা দরবারের জয়ধ্বনি দিতে দিতে দুখানা ঢাউস গাড়ি রওনা হল।

শ্রীচৌহান শুভদিনে শুভক্ষণে সাচ্চা দরবারের পানে ধেয়ে চললেন।

॥ ২ ॥

জমে উঠেছে মেলা।

এসেছে একটা সার্কাস আর একটা যাত্রা। হাড়-বার-করা মড়াখেকো একটা বাঘকে তাঁবুর বাইরে একটা লোহার খাঁচায় আটকে রেখেছে সার্কাসওয়ালা, ঐ বাঘই তার সম্বল।

খাঁচা থেকে বাঘকে বার করে দুবার খেলা দেখায়। সে খেলা দেখবার জন্যে দশটা নয়া-পয়সা খরচা করে কেউ তাঁবুর ভেতর ঢুকতে চায় না।

সার্কাসওয়ালার চেয়ে যাত্রাওয়ালার সম্বল বেশী।

তিন-তিনটে মেয়েমানুষ আছে যাত্রার দলে। সত্যিকারের মেয়েমানুষ, বিকেলের দিকে গায়ে জামা না পরে রাস্তার পাশে টিনের চেয়ারে বসে তারা চা খায়।

ফলে রাত এগারটায় যখন যাত্রা শুরু হয়, তখন কম-সে-কম শ'দুয়েক মানুষ টিকিট কিনে গান শুনতে বসে।

হাড়-বার-করা বাঘের চেয়ে সত্যিকারের মেয়েমানুষ বেশী মানুষ টানে।

দোকান বসেছে অগুণতি।

এক হাত চওড়া আর দু হাত লম্বা জমির দরুন পাঁচ টাকা হিসেবে ভাড়া দিয়ে তারা দোকান ফেঁদেছে।

সাচ্চা দরবারের অধীশ্বরই জানেন, ভাড়া মিটিয়ে ক-পয়সা তারা ঘরে নিয়ে যেতে পারবে।

পানের দোকানদার বালাখানা হোটেলওয়ালা হরতনকে বলেছে, সামনেবার মেলার এক মাস একটা মেয়েমানুষ ভাড়া করবে, যেমন হোটেলওয়ালা হরতন করেছে।

হোটেলে দু'টো মেয়েমানুষ লাগাবার দরুন হরতনকে দুখানা টেবিল বাড়াতে হয়েছে। দুখানা টেবিল মানে বারোখানা চেয়ার।

বারোখানা চেয়ার বাড়িয়েও ঠেলা সামলাতে পারছে না হরতন। ভেঙে পড়ছে মানুষ ওর হোটেলে।

কি করে যেন রটে গিয়েছে যে কলেজ-গার্ল দুজন হরতনের হোটেলে পরিবেশন করে। কলেজ-গার্ল দুটিকে জুটিয়েছে হরতন চন্দননগরের বাজার থেকে।

দিব্যি কায়দা করে কাপড়জামা পরেছে ওরা, দিব্যি ছুটোছুটি করছে এ-টেবিলে ও-টেবিলে।

পানের দোকানদার বালাখানা ঠিক ঐরকম একটিকে সংগ্রহ করে বসবে তার পানের দোকানে। পান-চুন-জর্দা তুলে দেবে খদ্দেরের হাতে।

ব্যাস, তাহলে আর দেখতে হবে না। এক মাস মানে,

এই মেলার মাসটা তাকে রাখলেই লাল, হরতন যেমন লাল হয়ে গেল।

ভারী তো খরচা, খাওয়াটা দিতে হবে আর নগদ পাঁচ টাকা।

ও দিয়েও যা থাকবে তাই যথেষ্ট।

হোটেলওয়ালা হরতনের নিজস্ব চাকর বালাই।

বালাই অবশ্য বলে সে হোটেলের সরকারবাবু। তার কাজ হোটেলের খদ্দের জুটিয়ে আনা। সে এখন তাস পেটায় যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে, আর যাত্রাদলের একটি মেয়ের কাছে গান শেখে—গোলেমালে গোলেমালে পীরিত কোর না।

অভিনেত্রীটির নাম বৃহন্নলা।

বৃহন্নলার দৌলতে যাত্রাদলের লোকেরা হরতনের হোটেল থেকে ভাল-মন্দ খেতে পায়।

সাচ্চা দরবারে কোনও হোটেলে মুরগী রান্না করার হুকুম নেই।

গোলেমালে গোলেমালে হোটেল থেকে রান্না করা মুরগী নিয়ে গিয়ে বালাই সেদিন যাত্রাওয়ালাদের সবাইকে ভুরিভোজন করিয়েছে। পর পর কয়েকদিন মুরগী না খেতে পেলে বৃহন্নলার নাকি গা ম্যাজম্যাজ করে।

সার্কাস আর যাত্রা বাদ দিলে মেলায় আর কি থাকে!

হ্যাঁ, ওধারে প্রকাণ্ড বটগাছটার তলায় কয়েকটি নাগা বাবা

এসে ধুনি লাগিয়েছেন। ভিড় জমে আছে তাঁদের ঘিরে। ভক্তরা গাঁজা চড়াচ্ছে আর প্রসাদ পাচ্ছে।

আনাড়ী মানুষ নাগা বাবাদের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারছে না, দম আটকে মরে যাবার ভয়ে।

বড় তামাকের কড়া ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে গাছতলা। মাঝে মাঝে গগনভেদী চিৎকার উঠছে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর থেকে—"ভোলে বোম্, বোম্ ভোলে, সাচ্চা দরবার—", জয়ধ্বনিটা শোনা যাচ্ছে না, সাচ্চা দরবার বলার সঙ্গে সঙ্গে এক নাগা বাবা শিঙা ফুঁকছেন।

হাজার হাজার ভক্ত বাঁকে করে জল বয়ে এনেছেন চৌদ্দ ক্রোশ দূরের গঙ্গা থেকে।

সারারাত ধরে তাঁরা বাঁক কাঁধে হেঁটে এসেছেন। প্রতিটি বাঁক ফুল দিয়ে সাজানো।

ছোট ছোট পেতলের ঘণ্টা আর ঘুঙুর ঝুলছে প্রতিটি বাঁকে। সাচ্চা দরবারের অধীশ্বরের মাথায় ভোররাত থেকে গঙ্গাজল চড়ছে।

বাঁক কাঁধে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কোনও কোনও ভক্ত মূর্ছা যাচ্ছেন। কেউ কেউ বা খেপে উঠে মন্দিরের গায়ে জলের কলসী ছুঁড়ে মেরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে লাইন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড জোরে এক পশলা করে বৃষ্টি হচ্ছে বলেই রক্ষে, বৃষ্টি না হলে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে

বহু ভক্ত গরমের চোটে ভিরমি যেতেন।

মারপিট লেগে যাচ্ছে এখানে-ওখানে। কেন লাগছে তা বলা মুশকিল।

দপ্ করে যেমন জ্বলে উঠছে খপ করে তেমনি নিভেও যাচ্ছে।

নিদারুণ কষ্ট আর হয়রানি সহ্য করতে করতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে দু'চারজনের।

বলার কিছুই নেই। সাচ্চা দরবারের আইন আলাদা। ওখানকার মারপিটের জন্য কেউ কাউকে দায়ী করে না।

পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের মোটরগাড়ি করে যাঁরা এসেছেন, আর পায়ে হেঁটে যাঁরা গিয়েছেন—দু'পক্ষই বরদাস্ত করছেন দু'পক্ষকে।

সাচ্চা দরবারের দরবারী কায়দা কিছু সময়ের তরে অন্ততঃ মানুষের মন থেকে মানুষকে ঘেন্না করার নিঘিন্নে প্রবৃত্তিটাকে ঘুচিয়ে ছেড়েছে।

বেলা দশটায় আধ ঘণ্টার জন্যে বোম্ ভোলের মাথায় জল ঢালা বন্ধ হল। ঢাক বাজতে লাগল, সাচ্চা দরবারের মুখ্যসেবক এসে ঘি দুধ মধু ঢেলে ভোলে বোম্‌কে স্নান করিয়ে রাশীকৃত ফল মেওয়া মিষ্টি চড়িয়ে গেলেন ভোলানাথের মাথায়।

আবার শুরু হল জল ঢালা। হাজার হাজার মানুষ তখনও বাঁক কাঁধে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

সবায়ের জল ঢালা শেষ হবে যখন, তা সে বেলা চারটেই বাজুক বা পাঁচটাই বাজুক, জল ঢালা শেষ হলে পর রেহাই পাবেন ভোলানাথ, তখন ভোগরাগ হবে।

ফুলের মালা পরে বিশ্রাম করবেন তখন থেকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত, আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না।

সাচ্চা দরবারে আরজি পেশ করতে হলে রাত্রে থাকতে হয়।

দিনের বেলা কে কার কথা শোনে! মাথায় অবিশ্রান্ত ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে থাকলে কেউ কিছু শুনতে পায় কি?

ভোলে বোম্ সকলের কামনা-বাসনা পূর্ণ করেন, যদি ওঁর কানে আরজিটা পৌঁছতে পারা যায়।

আশুতোষ কিছুতেই রুষ্ট হন না, কারও কোনও অপরাধই ওঁর কাছে অপরাধ নয়।

মহাপাপী আর মহাপুণ্যবান দুজনেরই সমান মূল্য সাচ্চা দরবারে। বিশ্বপিতা পরমেশ্বর যিনি, বিশ্বসুদ্ধ মানুষ যাঁকে বাবা বলে ডেকে বুকের জ্বালা জুড়োয়, তিনি কি কোনও কারণে রুষ্ট হতে পারেন।

বরং মহাকাল সর্বদ্রষ্টা, অনন্ত কোটি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র সাক্ষী, কার সাধ্য ওঁর নজর এড়িয়ে কোনও কিছু করবে।

বড়ুয়া সাহেব রাত্রে আরজি পেশ করার জন্যে তিনরাত সাচ্চা দরবারে কাটালেন।

ওঁর আরজিটা যে কি তা অবশ্য কেউ জানে না। মাঝে মাঝে উনি চলে আসেন সাচ্চা দরবারে, কয়েক রাত কাটিয়ে যান।

কোন্ দুঃখে যে মানুষ ঘরের পাশের মহাতীর্থ ছেড়ে নাজেহাল হবার জন্যে কাশী গয়া বৃন্দাবন ছোটে, তা উনি ভেবে পান না।

তীর্থ মানে পাণ্ডা গুণ্ডা রাঁড় ষাঁড় বাঁদর চোর আর গলাকাটা ঠগ্-জোচ্চরের আড্ডা। সাচ্চা দরবারে ঐ সমস্ত উপকরণের একটিও নেই।

পাণ্ডা অবশ্য আছেন কিছু, অত্যাচার জুলুম করা দূরে থাক্, কোনও যাত্রীর সঙ্গে তাঁরা গলা উঁচু করে কথাই বলেন না।

বাকী উপকরণের কিছুই নেই। সন্ধ্যা হল তো একদম নিঝুম হয়ে পড়ল।

ব্যাঙ ডাকছে, শেয়াল ডাকছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। পল্লীবাংলার আসল রূপ দেখার যার বাসনা আছে, সেই রূপ দেখে বুঁদ হয়ে যাবার শক্তি আছে যার, তার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান সাচ্চা দরবার।

কয়েকটা রাত ওখানে কাটাতে পারলেই মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়। একটানা ত্রিশ বছর শহরে শহরে ঘুরেছেন বড়ুয়া সাহেব। বড় বড় হুজুরদের সঙ্গে হরদম খানাপিনা করেছেন, আদবকায়দা বজায় রাখতে রাখতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে।

এখন উনি চান স্বস্তি, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, এই হচ্ছে ওঁর চরম অভিজ্ঞতা।

লাঞ্চ ডিনার ব্রেক্‌ফাস্ট খেতে খেতে জীবনে অরুচি ধরে গেছে।

ছোট্ট একটা বিছানা নিয়ে আর পত্নীকে নিয়ে পালিয়ে আসেন সাচ্চা দরবারে, বিব্‌ভুল ঠাকুরের ঘরে আশ্রয় নেন।

স্নান করেন পুকুরে, ব্রেক্‌ফাস্ট করেন গরম মুড়ি আর তেলে-ভাজা খেয়ে।

লাঞ্চ মোটে করেনই না। বাবার ভোগ হয়ে গেলে প্রসাদ পান। আর রাত্রে ওঁদের দুধ-মিষ্টি খেলেই চলে যায়।

কোনও হাঙ্গামাই নেই, খরচও নামমাত্র।

ঘরখানার জন্যে বিব্‌ভুল ঠাকুর দিনেরাতে তিনটে টাকা ভাড়া নেন।

এত কম ভাড়ায় ঘর পাওয়া যাবে কাশী গয়া বৃন্দাবনে? এত কম খরচে অন্য কোন তীর্থে গিয়ে থাকা যাবে?

মণিকুন্তলা দেবী মানে মিসেস বড়ুয়া গরদ পরে ঘুরে

বেড়ান। রাত চারটেয় পুকুরে চুবে তৈরী হয়ে গিয়ে দাঁড়ান বাবার দরজার পাশে।

বিব্‌ভুল ঠাকুর কোনও রকমে তাঁকে সেই সময় একটিবার মন্দিরে ঢুকিয়ে বাবাকে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে আসেন।

বাবাকে স্পর্শ না করে বাবার মাথায় জল না দিয়ে মণি-কুন্তলা নিজে জলগ্রহণ করবেন না।

বড়ুয়া সাহেব জানতেনই না যে পত্নীটির পেটে এতখানি ভক্তি জমা আছে।

সমানে স্বামীর সঙ্গে যিনি হুজুরদের নিয়ে এক টেবিলে বসে লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছেন, আগাপাস্তলা একটি আস্ত মেমসাহেব হয়ে সারাটা জীবন যাঁর কেটে গেল, বাথটব না থাকার দরুন বহু জায়গায় যাঁর স্নানই হয়নি, তিনি সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা পুকুরে চুবছেন। ভিজে কাপড় পরে বাবাকে স্পর্শ করার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন, মুড়ি চিবোচ্ছেন, সারাদিন গরদ পরে সাধু-সন্ন্যাসী খুঁজে বেড়াচ্ছেন মেলায়। রাত্রে বিনা মশারিতে মাদুরের ওপর শুয়ে তালপাতার পাখা চালাতে চালাতে শিবমন্ত্র জপ করছেন।

বড়ুয়া সাহেব দর্শন স্পর্শন পূজা ইত্যাদির ধারধারেন না।

সকালে যখন ঘুম ভাঙে তখন চায়ের দোকানওয়ালা একটা মাটির ভাঁড় আর এক কেটলি চা দিয়ে যায়। চা খেয়ে এক পাক ঘুরে আসেন উনি ভিড়ের মধ্যে।

তারপর মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে ব্রেক্‌ফাস্ট সেরে আর এক পাক ঘুরতে বেরোন।

মানুষ দেখতে ওঁর ভাল লাগে।

ত্রিশ বছর উনি মানুষ দেখেন নি, মানুষের সঙ্গে মিশতে পান নি, মানুষের কথা শুনতে পান নি।

ত্রিশ বছর স্রেফ আসামী দেখেছেন আর ফরিয়াদী দেখেছেন। শুনেছেন সাক্ষী নামক এক শ্রেণীর যন্ত্রের প্রলাপ, আর উকিল নামক আর এক জাত যন্ত্রের বিলাপ।

ত্রিশ বছর পরে এখন তিনি দেখছেন সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নায় গড়া বিশ্বসংসার।

কেউ পকেট মেরেছে শুনতে পেলে, এখন তাঁর ছ'মাস জেল খাটাবার কথা মনে হয় না।

মনে হয় পকেটমারটাকে পেলে তিনি তাকে কাছছাড়া করতেন না, অষ্টপ্রহর তাকে সঙ্গে রেখে বুঝতে চেষ্টা করতেন কেন সে পকেট মারে।

পকেট মারা ছাড়া উপার্জনের অন্য কোনও পন্থা পেলে কি সে পকেট মারার মত ঝুঁকিব কাজ করতে যাবে?

রাত্রে যখন সব নিঝুম হয়ে পড়ে, মণিকুন্তলা হাতপাখা চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েন, বড়ুযা সাহেব তখন নিঃশব্দে উঠে চুপচাপ চলে যান মন্দিরে।

নাটমন্দিরে যারা ধন্নায় পড়ে আছে, তাদের পাহারা দেন ঘুরে ঘুরে। আর মনে মনে ভোলানাথের কাছে আকুল

আবেদন জানান, নিজের জন্মে নয়, যারা ধন্নায় পড়েছে—তাদের জন্মে—"হে করুণাময়, আর দুঃখ দিও না এদের। হে দয়াল, রোগমুক্তি করে এদের রক্ষা কর।"

তারপর একটা ভয়ঙ্কর রকম বেআইনী প্রার্থনা জানান বোম্ ভোলের দরবারে—"হে সর্বদ্রষ্টা, আইন আদালত আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী উকিলের প্রয়োজন নেই একদম—এমন সমাজ হতে পারে না। আমাদের শুভবুদ্ধি দান কর পরমেশ্বর, তোমার প্রসাদে আমরা সবাই যেন নিষ্পাপ হয়ে বাঁচতে পারি।"

পরমেশ্বর বোধ হয় বড়ুয়া সাহেবের আকুল আবেদনে কান দিয়ে ফেললেন।

ফলে তাঁর পাপ-পুণ্য বিচার করার প্রবৃত্তিটিকেই ধ্বংস করতে চাইলেন একদম।

পরমেশ্বরের সংসারে পাপ কাকে বলে আর পুণ্য কাকে বলে তা কটা মানুষ জানে? ত্রিশ বছর এজলাসে বসে পেনাল্ কোডে লেখা ক্রাইম্‌গুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল বড়ুয়া সাহেবের।

পেনাল্ কোডের নাগালের বাইরে মানুষের শয়তানী বুদ্ধি কি খেলা খেলতে পারে তা স্বচক্ষে দেখলেন তিনি।

তারপর বোধ হয় "আমাদের শুভবুদ্ধি দান কর পরমেশ্বর" এই আরজিটি সাচ্চা দরবারে পেশ করার প্রবৃত্তিটাও লোপ পেল।

মণিকুন্তলা দেবীর ছোট কালো চাদরখানা জড়িয়ে বেরিয়ে

পড়লেন বড়ুয়া সাহেব।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখন। সরু গলিটা পার হয়ে আর একটু চওড়া গলিতে পড়লেন।

দু'পাশে দোকানঘর, সব বন্ধ। রাত প্রায় দু'টো তখন। দোকানগুলো পার হয়ে বাঁদিকে ঘুরতে হবে।

তারপর খানিকটা গেলেই বাবার নাটমন্দির দেখা যাবে।

নিশ্চিন্ত হয়ে চলেছেন। সাচ্চা দরবারে ভয়-ডরের কোনও কারণ নেই। আর দু'ঘণ্টা পরেই মন্দির খুলে যাবে, বোম্ ভোলের মঙ্গল আরতি শুরু হবে।

ইতিমধ্যেই হয়তো মন্দিরের উঠোনে বাঁক কাঁধে নিয়ে ভক্তরা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দুটো দোকানের মাঝখানে একটি মানুষ যেতে পারে এমন একটু সরু পথ রয়েছে। সেই পথে দোকানের পেছনের বাড়িতে যাওয়া-আসা চলে।

খানিকটা দূর থেকে দেখলেন বড়ুয়া সাহেব, ওধার থেকে দুটো মানুষ ধরাধরি করে কি যেন বয়ে নিয়ে এসে সেই গলিতে ঢুকে পড়ল।

পা থেমে গেল বড়ুয়া সাহেবের, এ সময় ওটা কি নিয়ে গেল ওরা।

বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন বড়ুয়া সাহেব যা ওরা বয়ে নিয়ে গেল। বুঝতে পারলেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না যেন।

এ কি হতে পারে ? এই মহাতীর্থে মানুষ ধরে নিয়ে যাচ্ছে ঐভাবে ? মানুষ ধরে নিয়ে গেল ! ওভাবে দু'জনে মানুষ ছাড়া আর কি নিয়ে যেতে পারে ?

কি হয়েছে মানুষটার ? অসুখ-বিসুখ করলে নিশ্চয়ই ঐভাবে নিয়ে যেত না ?

জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বেশ বোঝা গেল। খুব সম্ভব ওর মুখ বেঁধে ফেলেছে, তাই চেঁচাতে পারছে না !

কি মতলব ? খুন করে ফেলবে নাকি ?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন বড়ুয়া সাহেব সেই গলির মুখে, এধার-ওধারে তাকিয়ে টুপ করে ঢুকেও পড়লেন। নিরেট অন্ধকার, দু'পাশে দু'হাত ঠেকাতে ঠেকাতে এগিয়ে চললেন।

অনেকক্ষণ যেতে হল না, দু'পাশের দেওয়াল শেষ হল। অন্ধকারে বড়ুয়া সাহেব বুঝতে পারলেন যে একটা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বৃষ্টিটা জোরে পড়তে শুরু করল। একবার বিদ্যুৎ চমকালো। টিনের চালের বাড়ি, সামনেই উঁচু দাওয়া।

বিদ্যুৎ চমকাবার দরুন যেটুকু দেখতে পেলেন বড়ুয়া সাহেব তাই যথেষ্ট।

এগিয়ে গিয়ে তিনি দাওয়ায় উঠে পড়লেন।

একটিবারের জন্যেও ওঁর মনে হল না যে বিপদ ঘটতে পারে।

এই অবস্থায় ঐভাবে কেউ যদি দেখে ফেলে তাঁকে তা'হলে ফলটা কি দাঁড়াবে, সে চিন্তাটা উদয়ই হল না ওঁর চিত্তে।

তার বদলে তখন তিনি ভাবছেন, কোথায় নিয়ে গেল সেই মানুষটাকে ?

এধার-ওধার তাকাতে তাকাতে সরু একটু আলো দেখতে পেলেন। খুব সম্ভব দরজা-জানলার ফুটো দিয়ে আলোটা বেরুলো।

আলোটা লক্ষ্য করে আবার নামলেন দাওয়া থেকে, পেরিয়ে উঠলেন আর একটা দাওয়ায়।

আর একবার বিদ্যুৎ চমকালো। দেখতে পেলেন কাঠের সিঁড়ি।

সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলেন আলোটুকু দোতলা থেকে আসছে।

উঠে গেলেন দোতলায়। সঙ্গে সঙ্গে কানে গেল মানুষের গলার আওয়াজ।

খুবই চাপা গলায় কারা যেন কথাবার্তা বলছে।

একটু চেষ্টা করার পর ধরতে পারলেন তিনি কয়েকটা কথা।

"ঠিক করে বল্—এ তোর কে হয় ?"

"বলবি না কেমন ? কি করে কথা বার করতে হয় আমরা জানি। এই জংলা, ঐ ছুঁড়ীর জামাকাপড় সব কেড়ে নে।"

অল্প একটু হুটোপাটির শব্দ শোনা গেল। অস্পষ্ট একটু গোঙানিও যেন কানে গেল। তারপর আবার শোনা গেল সেই গলার আওয়াজ।

"এখনও বলবি কি না বল্?"

"আমার পরিবার।" আলাদা গলার আওয়াজ বোঝা গেল।

"পরিবার! ঠিক বলছিস? সত্যি কথা বল এখনও যদি বাঁচতে চাস। পরিবার নিয়ে এসেছিস ভাড়া খাটাতে?"

"ওসব আমরা করি না। মিছিমিছি আমাদের—"

"মিছিমিছি তোমাদের ধরে আনা হয়েছে? তিনজন মেড়োকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে বসে পাহারা দিচ্ছিলি আজই সন্ধ্যেবেলা। আজ ক'দিন ধরেই এই কম্ম করছিস। দিনের বেলা পরম ভক্তটি সেজে ঘুরে বেড়াস। মনে করেছিস আমাদের চোখে ধুলো দিবি, কেমন?"

ওপক্ষ থেকে আর জবাব পাওয়া গেল না। তার বদলে আর একজনের গলার আওয়াজ শোনা গেল—

"চেয়ারম্যান, পরীক্ষা করে দেখ না এ—ওর কি ধরনের পরিবার।"

চেয়ারম্যান আবার কথা বলতে শুরু করলেন—"এখনও বলছিস এ তোর পরিবার?"

জবাব হোল—"হ্যাঁ আমার বিয়ে করা পরিবার, মিথ্যে বলব কেন?"

"ঠিক আছে, পরীক্ষা দে, ছেড়ে দিচ্ছি। এই জঙলা, ওকেও ন্যাঙটা করে ফেল।" আদেশ প্রতিপালিত হল। লোকটা বোধ হয় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। একটা অস্তরটিপুনী খেয়ে অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠল। চেয়ারম্যান তখন চরম আদেশটি দান করলেন—"ওকে ধরে ঐ ছুঁড়ীর ওপর চড়া, পরিবারকে যা করে লোকে, তাই ও করবে আমাদের সামনে। তা'হলে বুঝব যে একটা সত্যি কথা অস্তুতঃ বলেছে। তারপর ওকে আর ওর পরিবারকে দূর করে দেওয়া হবে এই রাত্রেই। নে, যা বলছি তাড়াতাড়ি কর, ভোর হয়ে এল।"

এবার খানিকটা ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে গোঙানিও শোনা গেল যেন একটু।

চেয়ারম্যান বললেন—"পরিবার বাধা দিতে চাচ্ছে কেন? আরে আরে! লাথি মেরে স্বামীকে জখম করে ফেললে যে! দে তো ছুঁড়ীর মুখটা খুলে। শুনি কি ব্যাপারখানা।"

একটু পরেই শোনা গেল একটি মেয়ের গলা, কাঁদছে সে। কাঁদতে কাঁদতে তুবার বললে—"ও আমার বাবা, ও আমার বাবা।"

চেয়ারম্যান বললে—"তা আমরা জানি। মেয়েকে নিয়ে এসেছে হারামজাদা পয়সা রোজগার করতে। পরিচয় দিলে নিজের পরিবার বলে। পরিবার প্রমাণ করার জন্যে যা করতে গেল, বাপ হয়ে তারপর ওর শাস্তি কি হওয়া উচিত?

জঞ্জাল, কাপড়-চোপড় দিয়ে দে ওর মেয়েকে। তারপর ঐ হারামজাদাকে চিৎ করে ফেলে মুতে দে ওর মুখে। সেই মুত খাবে ও, তারপর ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।”

বড়ুয়া সাহেব আর শুনতে পারলেন না।

পা টিপে-টিপে নেমে এলেন নিচে। সাবধানে পার হলেন সরু গলিটা, তারপর পড়ি তো মরি করে দে ছুট।

ছুটে গিয়ে বাবার মন্দিরের দরজায় আছড়ে পড়ে কপাল ঠুকতে লাগলেন।

তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটিমাত্র কামনা শব্দহীন ভাষায় নিবেদিত হল ভোলানাথের দরবারে—“ভুলিয়ে দাও, ভুলিয়ে দাও, যা শুনলাম সমস্ত ভুলিয়ে দাও দয়াময়, বিস্মৃতি দাও, নয়ত পাগল হয়ে যাব।”

॥ ৪ ॥

ভিড় বাড়ছে।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় দু'খানা বেশী গাড়ি চলবে।

গাড়িতে আর কটা লোক আসে। লোক আসে হেঁটে।

তারপর পাঁচটা লাইনের অগুণতি বাস রয়েছে, লরি টেম্পো গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি রয়েছে, আছে সাইকেল। সাইকেলের পেছনে একঘড়া গঙ্গাজল তুলে ক' হাজার লোক আসে তার কি কোন হিসেব আছে?

সাচ্চা দরবারে কোনও কিছুরই হিসেব নেই। ভোলে বোম্ হিসেব-টিসেবের ধার ধারেন না।

মেলার আগে লরি-লরি চিনি এসেছে সাচ্চা দরবারে, এত চিনি এসেছে যার পরিমাণ সারা পশ্চিমবঙ্গের পুরো এক মাসের চিনি খরচের সমান।

ডেলা পাকানো হয়েছে সমস্ত চিনির। মাটির সরাতে সেই চিনির ডেলা সাজিয়ে ভোলে বোমের পূজা চড়াবে ভক্তরা, প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরবে।

বাবা স্রেফ চিনির ডেলা খান, চিনির ডেলায় কোনও প্রকারের ভেজাল বরদাস্ত করতে পারেন না। চিনির ডেলা পাকিয়ে সাচ্চা দরবারে বিক্রী করে পঞ্চাশ-একশ' বিঘে জমির মালিক হয়ে পড়েছে এমন মানুষ সাচ্চা দরবারের আশেপাশে বহুত আছে।

টাকা উড়ছে ওখানে, ধরতে পারলেই হল।

টাকা ধরে টাকাকে পোষ মানাতে পারে যে, পোষা টাকা যার ঘর থেকে উড়ে যায় না, সেই তো মানুষ। যেমন শ্রীচন্দ্রচূড় ভৌমিক।

চন্দ্রচূড় জানেন টাকাকে পোষ মানাতে।

ধান, চাল, পাট, আলু সব কিছুতেই টাকা আসে ওঁর ঘরে। বড় বড় কয়েকটা গুদোম আছে চন্দ্রচূড়ের।

সেই সব গুদোমে পাট ওঠে।

পাট শেষ হলে ধান উঠতে থাকে।

তারপর ওঠে আলু। দু'পাঁচ হাজার মণ আলু কিনে জমা করেন গুদোমে চন্দ্রচূড়। পাঠান সেই আলুর পাহাড় লরি বোঝাই করে পাঁচ ক্রোশ দূরের কোল্ডস্টোরেজে। তিন-গুণ দামে সেই আলু যখন ছেড়ে দেন বাজারে, তখন কে তাঁর মুনাফার হিসেব রাখবে! দরকার করে না হিসেব-টিসেবের। বছরে আলু থেকে ফেলে-ছড়িয়েও হাজার পঞ্চাশেক আসে এইটুকু মাত্র জানা আছে চন্দ্রচূড়ের, এবং ঐ জানাটাই যথেষ্ট।

খাতাপত্তরে হিসেব রাখতে গেলে নানা ঝামেলা।

কোনও প্রকার ঝামেলায় জড়িয়েপড়ার মানুষ নন চন্দ্রচূড়।

উনি হোলেন সাচ্চা দরবারের সাচ্চা-মানুষ। ভোলে বোম্ বাবার পরম ভক্ত।

বাবার চরণামৃত মুখে না দিয়ে কোনও দিন এক কাপ চা পর্যন্ত খান না।

বাবা জটিলেশ্বর চন্দ্রচূড়ের গুরুদেব।

ষোল বছর বয়সে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বাবার কৃপালাভ করেন চন্দ্রচূড়। বাবা বলেছিলেন—"যাও বেটা, এক রোজ তোর হো যায় গা।"

কি হো যায়ে গা তা অবশ্য বাবা বলেননি।

কিন্তু হয়ে তো গেল। আট-দশ বছর একবস্ত্রে ঘুরতে ঘুরতে সাচ্চা দরবারে এসে ঠেকলেন চন্দ্রচূড়।

বনমালী লস্কর তখন সবে উঠছেন। মাটির তলায় বালি

আছে, লস্কর মশাই কি করে জানতে পেরে গেছেন ঐ মহামূল্য তত্ত্বটি। জানতে পেরে এখানে-ওখানে-সেখানে দু'দশ বিঘে করে জমি কিনতে শুরু করেছেন।

এমন সময় চন্দ্রচূড় খাতা লেখার চাকরি নিলেন লস্কর মশায়ের গদিতে। তারপর বালি উঠতে লাগল। দিবারাত্র শত শত লরি বোঝাই হয়ে বালি ছুটতে লাগল শহরে।

শহরের বুকে বিরাট এক বাড়ি হাঁকড়ে লস্কর কোম্পানির আপিস হল।

লস্করের দুই কন্যে মিছরি আর মৌ চলে গেল শহরের বাড়িতে। শহরের স্কুলে লেখাপড়া করে মোটরগাড়ি হাঁকাতে শিখল তারা।

মাঝে-মধ্যে নিজেরা মোটর হাঁকিয়ে আসত যখন সাচ্চা দরবারে তখন ভিড় জমে যেত তাদের দেখবার জন্যে।

বনমালী অবশ্য শেষ দিন পর্যন্ত দেশের বাড়িতেই ছিলেন।

সাচ্চা দরবারে ভোলে বোম বাবার নাম করতে করতে সজ্ঞানে শিবলোকপ্রাপ্তি হল যেদিন তাঁর, সেদিন চোখ দিয়ে জল পড়েনি হেন মানুষ সাচ্চা দরবারে নেই।

তার কারণ লস্কর জীবনে একটি পয়সা দান করেননি।

দান করবার কথা শুনলে উনি খেপে উঠতেন।

দান করার মত নির্লজ্জ স্পর্ধা ছিল না তাঁর, কিন্তু কখন কার কি দরকার পড়ে তার খোঁজ রাখবার গরজ ছিল।

দরকার পড়লেই হল, লস্কর মশাই তৎক্ষণাৎ টের পেয়ে যেতেন দরকারটি, এবং সেই দরকারটিকে নিজের দরকার বলে জ্ঞান করতেন।

ফলে জীবনে তিনি একটি পয়সা দান করার সুযোগই পেলেন না।

সাচ্চা দরবারের আশপাশের বিশখানা গ্রামের যাবতীয় মানুষের সর্ববিধ আপদ-বিপদ যখন লস্কর মশায়ের নিজের আপদ-বিপদ, তখন দান করার ফুরসৎ তিনি পাবেন কেমন করে।

একদম দান-ধ্যান না করে বিশখানা গাঁয়ের যাবতীয় মানুষকে কাঁদিয়ে সজ্ঞানে শিবলোকপ্রাপ্তি হল যেদিন লস্কর মশায়ের, সেদিন ওঁর বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলোয় কি ছিল কত ছিল তা কেউ জানতেও পারল না।

মহাপুরুষবাবা জটিলেশ্বরের আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।

চন্দ্রচূড় ভৌমিক লস্করের দুই মেয়ে মৌকে আর মিছরিকে তাদের বাপের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে নিজে একখানি ছোট্ট মুদির দোকান খুললেন।

মুদির দোকানখানি এখনও চলছে। স্বয়ং চন্দ্রচূড় দোকানে বসে স্বহস্তে তেল, নুন, মশলা বিক্রী করেন। লোকে দেখে, বাহবা দেয়, সত্যিই আদর্শ ব্যক্তি। নিরহঙ্কার, নিরীহ মানুষ কাকে বলে যদি দেখতে চাও তা'হলে দেখে এস সাচ্চা দরবারে

গিয়ে চন্দ্রচূড় ভৌমিককে।

লাখ লাখ টাকা যে হাতে ঘরে তুলছেন ফি বছর সেই হাতে তিন পয়সার তেল ছ'পয়সার গুড় মেপে দিচ্ছেন। বিশ্বাস না হয় দেখে এস গিয়ে।

ও-হেন নিরীহ নিরহঙ্কার মানুষের জীবনেও বিপদ ঘটে। চন্দ্রচূড়ের জীবনে মহাবিপদ ঘনিয়ে উঠল।

সংবাদ এসেছে গুরুদেব জটিলেশ্বর বাবা স্বয়ং আসছেন সাচ্চা দরবারে।

সাড়ে তিনশ-চারশ শিষ্য-শিষ্যা তাঁর সঙ্গে আসছেন। দশখানা বাস, পঞ্চাশখানা মোটরগাড়ি, আর পাঁচখানা লরি আসছে।

তাঁবু সামিয়ানা. বাসন-কোসন আলো বিলকুল চলে আসছে গুরুদেবের সঙ্গে। দুটো লাউড্ স্পীকারও আসছে।

বিরাট যজ্ঞ হবে, আহুতির মন্ত্রগুলো লাউড্ স্পীকারে ছড়িয়ে পড়বে আকাশে-বাতাসে। অষ্টপ্রহর রাম-নাম গান হবে। আর হবে কাঙালীভোজন।

যে-কদিন থাকবেন জটিলেশ্বর সে-কদিন সমানে কাঙালী ভোজন চলা চাই। ওটার নাম দিয়েছেন বাবা ভোগ চড়ানো।

লাখ লাখ ভুখা ভগবানকে না খাইয়ে বাবা নিজের মুখে কিছু দেন না।

বহুবার বহু তীর্থে জটিলেশ্বর বাবাকে দর্শন করতে গেছেন

চন্দ্রচূড়। দেখে এসেছেন কি ভাবে বাবার সেবা করেন শিষ্যরা।

এবার তাঁর নিজের পালা পড়েছে। বিপদ আর কাকে বলে।

মেলা চলছে, তিল ধারণের স্থান নেই কোথাও।

চারিদিকের জমিতে এক হাঁটু জল, ধান রোয়া হয়ে গেছে।

মাঠ বলতে যে জমিটুকু ছিল তাতে সার্কাসওয়ালা আর যাত্রাওয়ালা খেলা দেখাচ্ছে। বিরাট এক বাগান আছে অবশ্য। বাগানটা বাবা ভোলে বোমের নিজের সম্পত্তি। সে বাগানে গৃহস্থদের প্রবেশ নিষেধ। জটিলেশ্বর বাবা অবশ্য সেই বাগানে তাঁবু ফেলতে পারেন।

কিন্তু ওঁর গৃহস্থ শিষ্য-শিষ্যাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা চাই। এবং শিষ্য-শিষ্যারা বাবার কাছে ছাড়া অন্যত্র থাকতে চাইবেন না।

অতএব গোটাতিনেক গুদোম উপড়ে ফেললেন চন্দ্রচূড়। টিনের দেওয়াল, টিনের চাল খুলে সব সরিয়ে ফেলা হল। সিমেন্ট বাঁধানো মেঝের ওপর তাঁবু পড়বে, জলেবৃষ্টিতে কাদা হবার উপায় নেই।

রাতারাতি গোটাদশেক টিউবওয়েল পোঁতা হয়ে গেল, অপর্যাপ্ত জলও তো চাই।

সেই সঙ্গে চাই বাথরুম, পায়খানা। অত তাড়াতাড়ি

স্যানিট্যারি ল্যাট্রিন বানানো সম্ভব নয়।

বহুত আচ্ছা, পঞ্চাশজন ধাঙড়-মেথরকে সপরিবারে নিযুক্ত করে ফেললেন চন্দ্রচূড়।

তাদের জন্যে আলাদা চালা বানিয়ে দিলেন রেল লাইনের ওধারে।

তারপর কিনতে শুরু করলেন রসদ। টিন-টিন ঘি, বস্তা-বস্তা কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম, ডাল, আটা, সুজি, চিনি, ডাব, নারকেল, আলু, কুমড়ো, সর্বস্ব চলে এল শহর থেকে।

চলে এল তিনটে ব্যাণ্ড্‌পার্টি, তিনটে তাসাপার্টি আর হু'দল শানাই। উঁচু-উঁচু দুই তোরণ বানিয়ে শানাইওয়ালাদের তার ওপর স্থাপন করলেন চন্দ্রচূড়। তিন দিন আগে থেকেই শানাই বাজতে লাগল।

তারপর প্রথমে এল তাঁবু, সামিয়ানা, বাসন-কোসন বোঝাই লরিগুলো। যারা সেগুলো খাটাবে, যারা বাবা জটিলেশ্বরের আসন পাতবে তারা এসে গেল হু'দিন আগে।

দেখতে দেখতে ছোটখাটো এক তাঁবুর শহর তৈরী হয়ে গেল। তারপর সংবাদ এল জটিলেশ্বর বাবা আসছেন।

পাঁচ মাইল আগে ব্যাণ্ড্‌পার্টি আর তাসাপার্টি নিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন চন্দ্রচূড়, শোভাযাত্রা করে গুরুদেবকে আনতে হবে।

তিনগুণ জমে উঠল মেলা।

সাচ্চা দরবারে ভোলে বোমের মাথায় জল চড়িয়ে ছুটল

সবাই জটিলেশ্বর বাবাকে দর্শন করতে। দেশ ঝেঁটিয়ে হাজার হাজার বাঙালী জমা হতে লাগল।

গাঁট-গাঁট কাপড় বিলোতে শুরু করলেন জটিলেশ্বরের এক কাপড়ের কলওয়ালা শিষ্য প্রেমজীভাই দোসানি।

যে-সব ভক্ত বাঁক কাঁধে নিয়ে হেঁটে আসে, তাদের সেওয়া করবার জন্যে আলাদা এক সেওয়াসদন খুলে ফেললেন যমুনাদাসজী ভাই। গাঁজা, ভাঙ, লাড্ডু, মিঠাই, শরবত, পান ইত্যাদি উপচার দিয়ে পূজা করতে লাগলেন ভোলে বোম ভক্তদের।

হরসুখলালজী ভাই দু'জন চোখের ডাক্তারকে আর এক-জন দাঁত ওপড়াবার ডাক্তারকে পাকড়াও করে আনলেন শহর থেকে। দুটো আলাদা তাঁবুতে চোখের আর দাঁতের হাস-পাতাল বসে গেল। চশমা এবং দাঁত বাঁধানো ফ্রী। সুতরাং চশমাওয়ালে একজন আর একজন দাঁত বাঁধানেওয়ালে হামেহাল হরসুখলালজীর সামনে হাজির রইল।

ইলাহী-কাণ্ড যাকে বলে।

সাচ্চা দরবারের ভোলে বোম্ বাবা জটিলেশ্বর বাবার প্রচণ্ড প্রতাপ দেখে বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আর স্তম্ভিত হলেন জটিলেশ্বর বাবার ভক্তগণ চন্দ্রচূড়ের ঐশ্বর্যের বহর দেখে।

এ পর্যন্ত যেখানে যাগ-যজ্ঞ, কাঙালীভোজন করিয়েছেন জটিলেশ্বর, তার সম্পূর্ণ ভার কোনও ভক্ত একলা স্কন্ধে নিতে

সাহস করেননি। বাঙালী ভক্ত চন্দ্রচূড়কে বাবার অন্য ভক্তরা চিনতেন না, এবার চিনলেন।

কারও কাছ থেকে একটি পয়সা সাহায্য নিলেন না চন্দ্রচূড়, বিপুল বিক্রমে গুরুসেবা চালাতে লাগলেন। কোথা থেকে যে অত টাকা বেরুতে লাগল, কেউ ধারণাই করতে পারলেন না। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের খেটে কাপড় আর আধময়লা একটা ফতুয়া পরা বাঙালীটা সত্যিই ভেলকিবাজি দেখিয়ে দিলে।

সর্বশেষ তুলাব্রত সমাপন করলেন চন্দ্রচূড়। অতি ক্ষীণ-দেহী বাবা জটিলেশ্বরের ওজন মাত্র এক মণ পাঁচ সের।

রুপোর তৈরী এক কাঁটা খাটানো হল, রুপোর চেনে দুখানা বড় বড় রুপোর থালা ঝুলতে লাগল। একটা থালায় বসানো হল গুরু জটিলেশ্বর বাবাকে, আর এক থালায় সাড়ে বাইশ সের সোনা আর সাড়ে বাইশ সের রুপো চড়ালেন চন্দ্রচূড়। তারপর সেই রুপোর তুলাদণ্ড সুদ্ধ সোনা-রুপোর বাটগুলো শ্রীগুরুচরণে দক্ষিণা স্বরূপ অর্পণ করে ফেললেন।

দারুণ হৈ-চৈ লেগে গেল। এত সোনা, এত রুপো কোথা থেকে পেলেন চন্দ্রচূড়? কোথায় রেখেছিলেন লুকিয়ে সোনা-রুপোর বাটগুলো? এতটা পরিমাণ সোনা-রুপো লুকিয়ে রাখাটা কি বেআইনী কাজ নয়?

আইন-বেআইনের প্রশ্নই উঠল না।

জটিলেশ্বর বাবা সমস্ত সোনা-রুপো দিয়ে দিলেন সরকারের হাতে। সরকার অন্ধদের হিতার্থে ঐ সম্পদ খরচা

করবেন, যুদ্ধের কাজে লাগানো চলবে না।

দিন পনরো পরে বিদায় হলেন জটিলেশ্বর বাবা। সঙ্গে সঙ্গে লোকে জানতে পারল চন্দ্রচূড় একদম ফতুর হয়ে গেছেন। মায় সেই ছোট্ট মুদিখানাটাও বিক্রী হয়ে গেছে।

॥ ৫ ॥

মেলা তখন জমজমাট। শ্রাবণী পূর্ণিমা এসে পড়েছে।

ক্যামেরা ঘাড়ে ঝুলিয়ে দুটি আমেরিকান সাহেব মেলা দেখতে এসেছেন। সাহেবদের বয়েস ত্রিশের নীচে।

ভয়ঙ্কর রকম জলুসওয়ালী একটি বঙ্গবালা সাহেবদের সঙ্গে ঘুরছেন। অনর্গল ইংরেজী বলছেন তিনি, চক্‌চকে দাঁত বার করে অনর্থক হাসছেন, শাড়ীতে পেঁচানো দেহটির প্রতিটি রেখাকে মুহুর্মুহু এমন ভাবে সঞ্চারিত করছেন যে সাহেব দুটি তাঁকে বার বার দু'পাশ থেকে ঠেসে ধরছে। ভয়ঙ্কর ভিড়ের দরুনই ঘটছে ঐ দুর্ঘটনাটা, ঘটছে বলে মহিলাটি খুবই মজা পাচ্ছেন। হেসে-গলে পড়ছেন একেবারে, সাহেবরাই তাঁকে সামলাচ্ছেন। হাজার হোক লেডি তো, ভিড়ের মধ্যে লেডিটিকে সাহায্য করা জেণ্ট মানুষের পবিত্র কর্তব্য।

মহিলাটির নাম বোধ হয় দ্যুতি, সাহেবরা ডুটি ডার্লিং বলে ডাকছেন।

কংসনিস্যূদন ঠাকুর চলনসই ইংরেজী বলতে পারেন।

পাকড়াও করেছেন তিনি ডুটি ডার্লিংকে, কাঁচুমাচু মুখ করে বাংলায় বোঝাচ্ছেন—"এসেছেন বাবার স্থানে, বাবাকে দর্শন করে যাবেন না, এটা কেমন কথা! নিয়ে চলুন সাহেব-দের আমাদের বাড়িতে, চমৎকার ঘর পাবেন, সাহেবরা বসে বিশ্রাম করবেন। জলটল খান, চা খান, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বাবাকে দর্শন করুন, প্রসাদী নির্মাল্য নিয়ে যান, বাবা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। বাবাকে দর্শন করে না গেলে অপরাধ হয়।"

সাহেবরা ডুটি ডার্লিংকে জিজ্ঞাসা করলেন কি বলছে লোকটা।

ডার্লিং ডুটি নিজের শরীরটাকে ভেঙেচুরে ভয়ানক মজার কথা সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন, লর্ড ভোলানাথকে দর্শন না করলে লর্ড অফেন্স্ নিতে পারেন আর খুশি হলে লর্ড যে যা প্রার্থনা করে তাকে তাই দিয়ে দেন।

"রীয়্যালি!" এক সাহেব ঐ রীয়্যালি কথাটি বলেই খপ করে জড়িয়ে ধরলেন ডার্লিংটির মাথাটা। নিজের মুখখানা ডার্লিংয়ের কানের ওপর চেপে ধরে কি যেন বললেন কানে কানে, নিজের মনোবাঞ্ছাটাই বোধ হয় জানালেন।

অদ্ভুত কায়দায় শরীরটিকে মোচড় দিয়ে সাহেবের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডার্লিং চোখ পাকিয়ে শাসন করলেন সাহেবকে নটি বলে। নটি কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে হেসে গলে পড়লেন যে আর একজন সাহেবকে

ওঁকে ধরে খাড়া রাখতে হল।

কংসনিসূদন তখন নিজে হাল ধরলেন। সাহেবদের বুঝিয়ে বললেন তাঁর চলনসই ইংরেজীতে যে রেস্ট নেবার জন্যে চমৎকার ঘর পাওয়া যাবে। সেখানে রেস্ট নিয়ে চা পান করে সাহেবরা ফিরবেন।

লর্ড শিবকে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে দর্শন করে যান সাহেবরা, এত কষ্ট করে যখন এসেছেন তখন হুট্ করে চলে যাবেন কেন।

সাহেবরা রাজী হয়ে গেলেন। চললেন ডার্লিংকে নিয়ে জড়ামড়ি করতে করতে কংসনিসূদনের পিছু পিছু।

কংস ঠাকুরের বুদ্ধি আছে, নিজের যাত্রী তোলা বাড়িতে নিয়ে গেলেন না সাহেবদের, বাজারে কোঁতকার দোতলায় তুললেন।

ডজন দুয়েক মানুষকে দিয়ে বিড়ি বাঁধায় কোঁতকা, ওর ফ্যাক্টরিজাত বিড়ির নামডাক আছে। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে দোতলা হাঁকড়েছে। নিচের তলায় ওর নিজের দোকান আর ফ্যাক্টরি চলছে। দোতলাটা মওকা পেলে ভাড়া দিয়ে দেয়।

তিনখানা ঘর আছে দোতলায়, প্রতিটি ঘরের ভাড়া রাত পিছু পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা। সাধারণ যাত্রীরা অত ভাড়ায় ঘর নেয় না। অসাধারণরা নেয়। ঘর নিয়ে রাত কাটাতে গেলে যেসব সরঞ্জাম লাগে কোঁতকা সাপ্লাই করে।

বিছানা, বালিশ, জল, জলের বালতি, আহার্য পানীয় যা চাইবে পাবে। গুড় থেকে তৈরী খাঁটি, জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাটি ধরালে দপ্ করে জ্বলে উঠবে এমন জাতের মাল একমাত্র কোঁতকাই সাপ্লাই করতে পারে।

তবে একটু বদনাম আছে কোঁতকার। যাক্ গে, বদনাম কার না আছে। বহু অসাধারণ মানুষ বহুবার আসছেন কোঁতকার দোতলায়, দু'এক রাত শান্তিতে কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন। সত্যিই যদি তাঁদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত কোঁতকা তা'হলে কি তাঁরা বার বার আসতেন। মান-সম্ভ্রম বলে কথা, মানী লোকের মান বাঁচাতে জানে কোঁতকা, যার মান নেই তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না।

সাহেবরা মানী লোক, কোঁতকা বিড়ি বাঁধবার কুলোটাকে কোল থেকে নামিয়ে সাহেবদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল। ভাঁড় বা গেলাস চলবে না, টি-পট্ মিল্ক-পট্ সুগার-পট্ চাই, ট্রে চাই, তিন জোড়া ভাল কাপ-ডিশ্ চাই। জুত করে সাহেবদের চা খাওয়াতে পারলে হয়তো খাঁটিও কিছু কাটবে। তোশকের ওপর ধোয়া চাদর বিছিয়ে তক্তপোশে সাহেবদের বসবার জায়গা হল।

তারপর ওদের ওপরে তুলে দিয়ে নিজে গেল কোঁতকা চা আনতে। চায়ের সঙ্গে এক প্যাকেট বিস্কুটও নিয়ে এল।

চায়ের ট্রে হাতে করে ওপরে উঠে পড়ে গেল বেকায়দায়। দরজা বন্ধ, ভেতরে হিলি-হিলি খিলি-খিলি তুমুল কাণ্ড চলেছে।

দেশী মেমসাহেবটি হেসে কুটিকুটি হচ্ছেন। খুব সম্ভব সাহেবরা ওঁর সর্বাঙ্গে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন।

এখন কর্ত্তব্য কি ? ডেকে চায়ের ট্রে ভেতরে দিয়ে আসবে নাকি! এ সময় কি বিরক্ত করা উচিত হবে! সাহেব মানুষ তো, খেপে গিয়ে যদি এখনই সরে পড়ে!

চতুর্দিকে হাজার হাজার মানুষ, বেলা তখন চারটে সাড়ে চারটে, নিচেই রাস্তা। সাহেবরা উঠেছে দোতলায় তাই ছোট-খাটো একটা ভিড় জমে গেছে দোকানের সামনে।

হিলি-হিলি খিলি-খিলি এত জোরে হচ্ছে যে রাস্তার লোকও শুনতে পাচ্ছে।

কোঁতকা বেচারা দারুণ বিপদে পড়ে গেল। হচ্ছে কি ওপরে যদি জানতে চায় লোকে, কি জবাব দেবে! গোলমাল একটা বেধে বসলেই হল, তীর্থস্থানে অনাচার নিবারণ করতে চায় যদি কেউ, তা'হলে থামাবে কি করে কোঁতকা ? এই দারুণ ভিড়ে কে কার কথা শুনবে! মার-মার শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়বে মানুষ, লুট হয়ে যাবে তার দোকান, তাকেও হয়তো মেরে পাট করে ফেলবে। না, ওদের থামানোই উচিত। হাঙ্গামা বাধলে সাহেব বলে কেউ ছেড়ে কথা কইবে না।

কোঁতকা ঘা দিল দরজায়। দু'চারবার ঘা দেবার পরে বন্ধ হল সেই বিকট হাসি। ভেতর থেকে মহিলাটি সাড়া দিলেন—"কে ? কি চাই ?"

"চা এনেছি।" জবাব দিলে কোঁতকা।

দরজা খোলার শব্দ হল, একটুখানি ফাঁক হল একখানা কপাট। কোঁতকা পিছিয়ে এল এক পা। শুধু বক্ষ-বন্ধনীটি রয়েছে মহিলাটির উপর অঙ্গে, নিম্নাঙ্গে রয়েছে শুধু সায়া। হাত বাড়ালেন মহিলাটি, বললেন, "চা দাও, আর এখন যেন কেউ বিরক্ত না করে।"

চায়ের ট্রে ওঁর হাতে দিয়ে কোঁতকা খুবই বিনীতভাবে বলল—"কিন্তু গোলমাল হচ্ছে যে। নিচে লোক জমে যাচ্ছে। তীর্থস্থান কিনা, গোলমাল বাধতে পারে।"

"কেন ?" ফোঁস করে উঠলেন মহিলাটি—"আমরা ঘর ভাড়া নিয়েছি, এক ঘণ্টার জন্যে দশ টাকা দোব।"

কোঁতকা একটু গরম হয়ে উঠল—"তা দেবেন ঠিকই, কিন্তু পিটুনি খেয়ে মরবেন কেন ? লাখখানেক যাত্রী আর দোকানদার সজাগ রয়েছে, থাকুন রাত্রে, সব নিঝুম হোক, তখন ঘরের দরজা বন্ধ করবেন। কেলেঙ্কারি যদি বাধে—"

ওর কথা শেষ হল না। ভেতর থেকে সাহেবরা কি যেন বলে উঠলেন। তাঁদের বোধ হয় তর সইছে না। দরজা বন্ধ করে দিলেন মহিলাটি কোঁতকার মুখের ওপর। কোঁতকা থ মেরে গেল।

একটু পরে সে নেমে গেল নিচে। বেশ রেগে উঠেছে তখন। কি আস্পর্ধা! তার বাড়ি, তার ঘর, তার তক্তপোশ, বিছানা, সমস্তই তার। আর তারই মুখের ওপর দরজা বন্ধ

করে দিলে। ওরা ভাবলেটা কি?

ওরা তখন করছে কি তার মাথায় চড়ে বসে, তাই ভাবতে লাগল কোঁতকা কুলো কোলে করে বসে। ভাগ্য ভাল তার, ওপরে আর সেই পৈশাচিক হিলি-হিলি খিলি-খিলি চলছে না। ভিড় কিন্তু একটু জমেই রইল দোকানের সামনে। সাহেবরা যখন নেমে আসবে তখন তাদের দর্শন করা চাই।

কি যেন হল হঠাৎ ওপরে। ভীষণ হুটোপাটি হচ্ছে, হুম-দাম ঢিপ-ঢাপ আওয়াজ হচ্ছে, ঝন্-ঝন্ শব্দে চায়ের সরঞ্জামগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

কুলো ফেলে লাফিয়ে উঠল কোঁতকা। ওর কারিগররাও হাত চালানো বন্ধ করে ফেলেছে।

ছুটল কোঁতকা ওপরে, সিঁড়িতে পা দিয়েছে আর অমনি ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়ল পাঁচ হাত দূরে দেওয়ালের গায়ে। তারপর কি হল একদম জানতেই পারল না।

আধ ঘণ্টা পরে হুঁশ হল কোঁতকার।

শুনল তখন শ্রাদ্ধটা কতদূর গড়িয়েছে। সাহেব দু'জন বেদম মারপিট করছিলেন নিজেদের মধ্যে। দু'জনেরই নাক থেবড়ে গেছে, দাঁত ভেঙে গেছে, চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে। সেই অবস্থায় তাঁরা ডার্লিংটিকে ফেলে রেখে চম্পট দিয়েছেন। গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন ওঁরা, গাড়ি রেখে এসেছিলেন বড় রাস্তায়, ভিড়ের ভেতর দিয়ে এতটা পথ দৌড়ে গেছেন, বহুলোক ওঁদের ধাক্কায় জখম হয়েছে।

সাহেব দেখে কেউ ওঁদের আটকাতে সাহস করেনি। তবে বাঁকওয়ালারা বোধ হয় দু'চার ঘা বাঁকের বাড়ি কষিয়েছে।

ওদের সেই মেমসাহেবটির কি হল ?

কি যে হল তাঁর কেউ জানে না। সাহেব দু'জনের পেছনে ছুটেছিল সবাই, মেমসাহেবটির কথা ভুলেই গিয়েছিল। পরে যখন তাঁর খোঁজ করা হল তখন তিনি বেমালুম হাওয়া হয়ে গেছেন। এই ভিড়ে কোথায় যে লুকিয়ে পড়েছেন কে বলবে !

কংসনিসূদন ঠাকুর এসে কোঁতকাকে সহানুভূতি জানিয়ে গেলেন। ভাল ভেবেই তো তিনি এনেছিলেন ওদের, শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়াবে কে জানত।

কোঁতকা কিছু বলল না ঠাকুরকে। উত্থানশক্তিরহিত হয়েছে তার তখন, কোমরে ভীষণ চোট পেয়েছে। মনে মনে ফুলতে লাগল কোঁতকা, যদি ওঠবার শক্তি থাকত তার তা'হলে খুঁজে বার করত সেই মাগীকে।

আর একবার যদি তার দেখা পায়—

॥ ৬ ॥

ভোলে বোম্, ভোলে বোম্, ভোলে বোম্ !

সাচ্চা দরবার কি জয়, সাচ্চা দরবার কি জয় !

বোম শঙ্কর কৈলাসপতি শম্ভো, পার লাগা দো বাবা,

ভোলে বোম, ভোলে বোম্…

চলছে সবাই, গঙ্গা থেকে জল ভরে সোজা বাবার দরবার। কেউ বলে তের ক্রোশ, কেউ বলে চোদ্দ।

তা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। হাজার হাজার মেয়েও যাচ্ছে বাঁক কাঁধে নিয়ে। বোম্ ভোলে সবাইকে পার করে নিয়ে যাবেন, কেউ পড়ে থাকবে না।

পার লাগা দো বাবা—ভোলে বোম্ কৈলাসপতি শম্ভো।

সন্ধ্যার দু' ঘণ্টা আগে জল ভরা হল। নতুন কাপড়, নতুন গেঞ্জি, নতুন গামছা এবং নতুন লেঙট, বিলকুল নতুন চাই। সের-পাঁচেক করে জল ধরে এমন মাপের দুটি মাটির ঘট চাই। তামার ঘট পিতলের ঘট অনেকেই নেয়।

কেউ কেউ চলেছে রুপোর কলসী বাঁকে ঝুলিয়ে।

চলেছে সবাই, আশী বছরের বৃদ্ধ চলেছে, আট বছরের বাচ্চা চলেছে। বুড়ী দিদিমার সঙ্গে তরুণী নাতনী চলেছে। হলুদ রঙে ছোপানো কাপড় পরে লাল গামছা কোমরে বেঁধে, ফুল, ফুলের মালা, ছোট ছোট ঘণ্টা, ঝুমুর বাঁধা বাঁক কাঁধে নিয়ে সারারাত হেঁটে চলেছে বাবা ভোলানাথের খেপা সন্তানেরা, পথ আর রাত দুই-ই কাবার হয়ে যাচ্ছে বাবার দয়ায়।

বাবার তরফ থেকে নতুন সূর্য ওদের অভ্যর্থনা করবে সাচ্চা দরবারে। অসত্য আর অন্ধকারের হবে অবসান, নব জীবনের নতুন সূর্যোদয় হবে সাচ্চা দরবারে।

সংশয়, ঘৃণা, ভয়, আর পরের সর্বনাশ করার সর্বনেশে প্রবৃত্তিটা রইল মা গঙ্গার জলে, নিষ্পাপ হয়ে ছুটেছে সবাই সাচ্চা দরবারে জল চড়াতে। জল মানে জীবন, জীবনেশ্বরকে জীবন ছাড়া আর কি দিয়ে তুষ্ট করা যায়।

ভোলে বোম্, ভোলে বোম্, ভোলে বোম্ কৈলাসপতি শম্ভো—

রাত দেড়টায় চন্দ্র অস্ত যাবে। আজ একাদশী আর তিন রাত পরেই পূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা। এ বছরের মত মেলা শেষ।

পূর্ণিমার এত কাছে এসে ওরা সময় পেলে, মানে ছুটি পেলে। অন্ধকার পাওয়াই মুশকিল, রাত দেড়টায় চন্দ্র অস্ত যাবে।

আকাশে যদি মেঘ না থাকে তাহলে চন্দ্র অস্ত যাবার পরেও অন্ধকার হবে না। কিন্তু মেঘ থাকবেই আকাশে, বৃষ্টি হবেই, বাবা দয়া করবেন।

বাঁক কাঁধে নিয়ে বিজয়া চলেছে, বিজয়ার ছোট বোন জয়া চলেছে, আর চলেছে মৌসুম। মনে মনে বাবার চরণে নিবেদন করছে বিজয়া—"বৃষ্টি দাও বাবা, আকাশ ভেঙে বর্ষা নামুক, ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে যাক, বজ্র হানো, বিদ্যুৎ চমকাক, প্রলয় নৃত্য জুড়ে দাও নটরাজ, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

ওদের সিকি মাইল আগে আঠার জন সাজোয়ান পুরুষের

একটি দল চলেছে। তাদের প্রত্যেকেই ছ' ফুটের ওপর লম্বা, ডন বৈঠক কুস্তি করা পেটা শরীর, খুব ছোট করে পালোয়ানি প্যাটার্ণের চুল ছাঁটা।

ওদের লেঙট হলদে রঙের, লেঙটের ওপর এক খণ্ড পাতলা কাপড় জড়িয়েছে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের, সেই কাপড়ের রঙও হলদে, গেঞ্জি রয়েছে সবায়ের গায়ে, গেঞ্জিও হলদে। শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে কোথা থেকে যে ওরা অত গাঁদা ফুল কুড়িয়েছে কে জানে।

গাঁদা ফুলের মালা জড়িয়েছে বাঁকে, নিজেরা এক ছড়া করে মালা মাথায় জড়িয়েছে। সমানে এক তালে পা ফেলে চলেছে ওরা, মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক ছাড়ছে—"ভোলে বোম্, সাচ্চা দরবার কি জয়।"

একখানা জিপ চলেছে তাদের আগে। নিশ্চয়ই কোনও বড় ঘরের আওরত চলেছেন জল ঢালতে। হেঁটে চলেছেন তিনি জল কাঁধে নিয়ে, গাড়ি চলেছে খানিক আগে বা পিছে, যদি দরকার পড়ে গাড়িতে উঠে পড়বেন।

খুবই আস্তে আস্তে চলেছে জিপখানা, মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ছে। তার মানে বড় ঘরের ঘরণীটি পিছিয়ে পড়ছেন। আগাগোড়া সারা পথ জুড়ে চলেছে ভক্তরা, তাই গাড়িখানাকে খুবই সাবধানে চালাতে হবে।

কোন ভক্তের এতটুকু অসুবিধে না হয়, এটাও তো দেখা চাই।

ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুমুর-ঝুমুর—ঝুন-ঝুন, টুন্-টুন্, ঝুমুর-ঝুমুর, ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্—সমান তালে বাজনা বাজছে।

বৃষ্টি এল, আকাশ কিন্তু অন্ধকার হল না, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে একাদশীর চাঁদ ছুটোছুটি করতে লাগল।

আর দু' মাইল, হাঁ, আর ঠিক দু' মাইল পরে ডান দিকে পাওয়া যাবে সেই রাস্তাটা, পাঁচ মাইল সেই রাস্তায় ছুটতে পারলে বর্ধমান রোডে যদি পড়া যায়—

যে লোকটি জিপ চালাচ্ছে তার দাড়ি পাগড়ি লোহার বালা সগৌরবে ঘোষণা করছে যে সে পঞ্চনদীর তীরের মানুষ। তার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি নিরীহ বাঙালী। একদম ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালী, বাঙালীত্ব জাহির করার জন্যে প্লাট-করা সিল্কের চাদর ঝোলানো হয়েছে, রাত দেড়টার সময়ও সে চাদর এতটুকু এধার-ওধার হচ্ছে না।

আদর্শ বাঙালীটি ঘড়ি বার করলেন পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে। জিপের বাইরে হাত বাড়িয়ে ঘড়ি দেখে নিলেন। তারপর পরিষ্কার বাঙলাতেই ফিসফিস করে বললেন—"একটা কুড়ি, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বোধ হয় এরা পৌঁছবে সেখানে। কিন্তু ওরা যে পিছিয়ে পড়ল।"

যে গাড়ি চালাচ্ছে সে কোনও জবাব দিল না। আস্তে আস্তে গাড়িখানা রাস্তার পাশে দাঁড় করালে। বাঙালীটি বলে উঠলেন—"থামালে যে?"

এবারও কোনও জবাব নেই, গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে

এঞ্জিনের ঢাকা খুলে কি যেন নাড়া-চাড়া করতে লাগল ড্রাইভারটি। একটু পরেই সেই আঠার জনের দলটি ওদের পাশে এসে পড়ল। ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা হাঁক ছাড়ল—"সাচ্চা দরবার কা জয়, ভোলে বোম্।"

ড্রাইভার বেশ ফুর্তিসে জবাব দিল—"পার লাগা দো বাবা।"

ওদের মধ্যে একজন আহেলা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করল—"কা হো, কুছ গড়্‌বড়্ হোইল্ বা ?"

পঞ্চনদীর তীরের মানুষ ড্রাইভারও আহেলা হিন্দী চালালে, "তেনী ভর গোঁসা চড় গৈ মেরা সেঁইয়াকী।"

হিন্দীটা বোধ হয় শাস্ত্রসম্মত হল না, ওরা সবাই হো হো শব্দে হেসে উঠল।

ড্রাইভারটি তাড়াতাড়ি এঞ্জিনের ঢাকা বন্ধ করে গাড়িতে উঠে বসল। প্রবল বিক্রমে গর্জন করতে শুরু করল এঞ্জিন, এতটুকু কিন্তু নড়ল না।

ভোলে বোম্, ভোলে বোম্, ভোলে বোম্—

দলের পর দল চলে যাচ্ছে গাড়ির পাশ দিয়ে।

বিজয়া, জয়া, মৌসুম এসে পড়ল। গাড়ির পাশে পৌঁছে গেল ওরা, তখন গর্জন থেমেছে গাড়ির।

হঠাৎ সেই শিখ ড্রাইভারটি লাফ দিয়ে নামল, গাড়ি থেকে। একটানে জয়ার বাঁকখানা ছিনিয়ে নিলে। পরমুহূর্তে দু'হাতে সাপটে ধরলে জয়াকে, গুঁজড়ে ফেললে জিপের

মধ্যে। তারপর মাত্র তিন সেকেণ্ড লাগল তার গাড়িতে উঠতে আর গাড়ি ছোটাতে।

বিকট শব্দে হর্ন চেঁচাতে লাগল, সামনের মানুষরা দু' পাশে ছিটকে পড়ল।

হাহাকার করে উঠল বিজয়া, বাঁক ফেলে দিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। ভিড় জমে গেল ওদের ঘিরে। কি সর্বনাশ! এতগুলো মানুষের ভেতরে থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল মেয়েটাকে।

"ডাকাত ডাকাত"—রৈ-রৈ চিৎকার উঠল। জিপের মধ্যে উঠে বসে জয়া তখন পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে।

সেই আঠার জনের দলের ভেতর ঢুকে পড়েছে তখন গাড়ি। সবায়ের কাঁধেই বাঁক, বাঁক. নামালে জল নষ্ট হয়ে যাবে। সরে দাঁড়িয়েছে ওরা তখন রাস্তার দু'পাশে। শুনছে যে একটা আওরাত গাড়ির মধ্যে চেঁচাচ্ছে। কি হয়েছে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন ছুঁড়ে ফেলে দিলে বাঁক, লাফ মেরে উঠল জিপের পাদানে, গাড়ি কিন্তু রুখল না। কান ফাটানো হর্ন বাজাতে বাজাতে চক্ষের নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

সেই আদর্শ বাঙালীটি বাংলা ছেড়ে ইংরেজীতে বললেন —"স্প্লেণ্ডিড্!"

ড্রাইভারটি বাংলা চালালেন—"সাবধান অহিদা, ভাল

করে ধরে থাক, ডান দিকে ঘুরছি।”

জয়া তখনও সমানে চেঁচাচ্ছে।

যে লাফিয়ে উঠে পাদানে দাঁড়িয়ে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে সে বলে উঠল, “আর চেঁচাতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে।”

বাঙালী ভদ্রলোকটি বললেন—“আমার এই চাদরখানা দিয়ে মুখখানা বেঁধে ফেললে কেমন হয়?”

চেঁচানি থামিয়ে জয়া জিজ্ঞাসা করলে—“কিন্তু দিদি আর মৌসুম যে রয়ে গেল।”

ডান দিকের রাস্তায় ঢুকে পড়েছে তখন গাড়ি। সে রাস্তায় যাত্রী নেই, ষাট মাইল স্পীডে ছুটছে।

ড্রাইভার বলল, “আমার পেছন দিয়ে উঠে পড় অহিদা, ছেড়ে ফেল তোমার পোশাক, প্যাণ্ট-শার্ট ওখানেই আছে। জুতোও আছে এক জোড়া। নাও, তাড়াতাড়ি কর। মিনিট দশেকের ভেতর বর্ধমান রোড পাচ্ছি।”

আর একবার জয়া বলতে গেল—“দিদি আর মৌসুম যে—”

ড্রাইভারটি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল—“আচ্ছা ব্যাদ্‌ড়া মেয়েমানুষ তো। এত কষ্ট করে ডাকাতি করে নিয়ে যাচ্ছি, খামকা ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ করছে। বাঁধুন তো স্বস্তিকদা ওর মুখখানা।”

স্বস্তিকদা বললেন জয়াকে—“এতক্ষণে তোমার দিদি আর মৌসুম উল্টোদিকে ছুটে চলেছেন। পেছনে একখানা গাড়ি

আছে। তাতে আছেন দুই শেঠজী, তাঁরা ওদের তুলে নিয়ে ছুটেছেন শহরের দিকে। মানে তোমার দিদির বোনটিকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে কিনা, তাড়াতাড়ি শহরে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে বোনকে উদ্ধার করা যাবে না।"

জয়া বেচারী ড্রাইভার আর স্বস্তিকদার মাঝখানে বসে পড়েছে তখন, মিনমিন করে বলল—"একটু জল পেলে হত। চেঁচাতে চেঁচাতে গলা চিরে গেছে।"

অহিদা মানে অহিভূষণ যিনি গাড়ির পেছনে পোশাক পাল্টাচ্ছিলেন, তিনিও ঐ কথা বললেন—"এই কৌশিক, আমারও খুব তেষ্টা পেয়ে গেছে যে, সমানে এতটা বাঁক কাঁধে হেঁটে আসছি।"

কৌশিক মানে গাড়ির ড্রাইভার সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—"চার বোতল জল পেছনের সিটের তলায় আছে।"

ভোলে বোম্, ভোলে বোম্, সাচ্চা দরবার কি জয়!

পার লাগা দো বাবা শিব-শম্ভো।

সেই আঠার জনের দলটি তখন সতের জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মুখে আর রা নেই। বাবা বোম্ ভোলে তাদের অকূল পাথারে ফেলে দিলেন। এখন উপায়?

বাঙালীটা তাদের ডুবিয়ে ছাড়লে।

সাত বছর জেল হয়েছিল লোকটার, বহু লোককে নাকি খুন করেছে, চাষীদের খেপিয়ে দিয়ে লোকটা নাকি বড় মানুষের ঘর জ্বালাত, আউর বহুত ভি জুলুম চালাত মালিকদের ওপর, সরকার ওকে বহু কষ্টে পাকড়ে সাত বছর জেল দিয়েছিলেন।

জেলে ঢুকে লোকটা এমনই ভালমানুষ সাজল যে সব কটা ওয়ার্ডারকে ভেড়া বানিয়ে ছাড়লে।

তারপর এসে গেল শ্রাবণী মেলা।

বাবার শিরে জল চড়াবার জন্যে লোকটা পাগল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত বড় জমাদার সাহেব ওকে সাচ্চা দরবারে ভেজবার একটা মতলব ঠাওরালেন।

সতের জন ওয়ার্ডার চলেছে সাচ্চা দরবারে, বড় জমাদার বহুত তোড়জোড় করে এক রাত্তিরের জন্যে ওকে বার করে দিলেন।

বড়বাবু, ছোটবাবু, বাঙালী ওয়ার্ডাররা কেউ টেরই পেল না যে একটা কয়েদীকে এইভাবে বাবার মাথায় জল চড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিন্তু শয়তানটা যে এধারে ভাগবার জন্যে এত বড় তোড়-জোড় করে বসে আছে তা কে ভাবতে পেরেছিল?

ভোলে বোম্, ভোলে বোম্, সাচ্চা দরবার কি জয়!

ওরা পৌঁছে গেল সাচ্চা দরবারে। চড়াল বাবার মাথায় জল।

তারপর ফিরে গেল গাড়িতে চেপে। মুখ একদম বন্ধ। বড় জমাদার সাহেবের কাছে পৌঁছনো তক মুখ খোলা হবে না। কয়েদীটা জেল থেকেই ভেগেছে, কখন কিভাবে ভাগ্‌ল, সবই জানেন বড় জমাদার সাহেব।

এমন ভাবে সাজাবেন কেসটা যে কেউ টঁ্যা-ফোঁ করতে পারবে না।

বিকেলের গাড়িতে ওরা মা-বেটা এসে পৌঁছল সাচ্চা দরবারে।

বাবার মাথায় জল চড়াবেই বিজয়া, দুধ গঙ্গাজল বাবার দরবারে কিনতে পাওয়া যায়। বাবা তার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন।

মৌসুম একেবারে বোবা হয়ে আছে।

দু'তিনবার সে চেষ্টা করেছিল তার নিজের বাবাকে একটিবার ছোঁবার জন্যে। সতের জন সাজোয়ান ওয়ার্ডারের সঙ্গে বাঁক কাঁধে নিয়ে চলেছে তার বাবা, মাত্র কয়েক হাত তফাত, মৌসুমের বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল তখন।

মায়ের পাশে পাশে হেঁটেছে সে নিজের বাঁক কাঁধে নিয়ে, কোন রকমে নিজের পা দুখানা বশে রেখেছে। বিজয়া ছেলেকে বার বার সামলেছে—"ডোবাসনি বাবা, ডোবাসনি। নিশ্চয়ই তুই ছুঁতে পাবি তোর বাবাকে, একটু ধৈর্য ধর। সাত-সাতটা বছর ওরা আটকে রাখবে

তোর বাপকে, উঃ সাত বছর! নিশ্চয়ই মরে যাবে ও, নিশ্চয়ই মরে যাবে। তোর বাপ জঙ্গলের বাঘ, তাকে খাঁচায় আটকে রাখলে বাঁচবে কেন? একটু ধৈর্য ধর, এই রাত্রেই এস্পার ওস্পার হবে একটা। কিছুতেই ওরা ঐ জঙ্গলের বাঘকে আটকে রাখতে পারবে না।”

তাই হল। জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলে চলে গেল।

মৌসুম কিন্তু তার বাবাকে একটিবার ছুঁতে পেল না। তাই বোবা হয়ে গেছে মৌসুম। আবার তাকে আসতে হল মায়ের সঙ্গে, মা শিবপুজো না করে জল পর্যন্ত খাবে না। মুখ টিপে আছে মৌসুম, ছেলের মুখপানে তাকিয়ে বিজয়াও কিছু বলতে সাহস করছে না।

বাঘের বাচ্চা, বাপকে ছুঁতে পেল না, বাপের কাছে যেতে পেল না, ভেতরে ভেতরে ফুলছে। কিছু না বলাই ভাল, হিতে বিপরীত হতে পারে।

আর মাত্র দুটো দিন, তারপরই মেলা শেষ। এক লাখ মানুষ জেগে আছে সাচ্চা দরবারে, দোকানপসার সব খোলা।

এই তিনটে রাত ভোলে বোম্ ঘুমোবেন না। রাতে খোলা থাকবে মন্দির, রাজ-রাজেশ্বর সেজে সারারাত ভক্তদের দর্শন দেবেন ভোলা দিগম্বর।

শেষ রাত থেকে জল চড়বে তাঁর মাথায়।

একটি ভক্তও জল না চড়িয়ে ফিরে যাবে না।

আকাশে চাঁদ হাসছে, একফোঁটা মেঘ নেই। বিশ্বেশ্বরের

সামনে ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়া, ছ'চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে।

মুহুর্মুহুঃ কেঁপে উঠছে আকাশ-বাতাস, লক্ষ কণ্ঠ হুংকার দিচ্ছে—সাচ্চা দরবার কা জয়!

ভবানীশঙ্কর পাণ্ডা বোম্ ভোলের রাতের চাকর। রাত্রে বাবাকে তামাক সেজে দিতে হয়, গাঁজা তৈরী করে দিতে হয়, রাজবেশ খুলে রাতের সাজে সাজিয়ে দিতে হয়। খাট, বিছানা, খড়ম, জলের জায়গা সমস্ত বাবার ঘরে সাজিয়ে দিয়ে ভবানীশঙ্কর হাতে তালি দিয়ে গাইতে শুরু করলেন—

হর-হর-হর মহাদেও।

ওঁর সুরে সুর মিলিয়ে হাজার কণ্ঠে গেয়ে চলল—হর-হর-হর মহাদেও। পাষাণ-দেবতা নিজেও যেন সেই সুরের তালে তালে দুলতে লাগলেন।

প্রত্যেকটি মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে। ঐ স্তব, কেউ একটু নড়ছে না।

ভবানীশঙ্করের দাদা পার্বতীশঙ্কর ভিড়ের ভেতর অতি কষ্টে ঘুরছেন। কাকে যেন খুঁজছেন উনি, প্রতিটি মহিলার মুখপানে ভাল করে নজর দিচ্ছেন। অন্য কারও পক্ষে ঐ কর্মটি করা দস্তুরমত বিপদ্‌জনক হয়ে দাঁড়াত। পার্বতীশঙ্করের পক্ষেই সম্ভব ঐ ভাবে মহিলাদের মুখ নিরীক্ষণ করা। ওঁকে চেনে সবাই, যারা চেনে না তারাও ওঁর পানে তাকিয়ে মাথা নত করে।

দিবারাত্র অষ্টপ্রহর জপ-তপ নিয়ে থাকেন পার্বতীশঙ্কর, কচিৎ কখনও ওঁকে সাচ্চা দরবারে ঘুরতে দেখা যায়। সকাল-সন্ধ্যে দু'বার বাবার মন্দিরে ঢুকে বাবাকে স্পর্শ করে গিয়ে নিজের আসনে বসেন, যাত্রী-যজমানের পরোয়া করেন না। সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে পার্বতীশঙ্করের মুখ-চোখ দেখে, যে মানুষটি একটু অন্য জাতের। মেটে-মেটে রঙের পার্বতীশঙ্কর, কিন্তু সেই মেটে রঙের ভেতর থেকেও কেমন যেন একটু স্নিগ্ধ আলো ফুটে বেরুচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত যাকে খুঁজছিলেন তাকে পেয়ে গেলেন পার্বতীশঙ্কর। বিজয়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—"চলে আসুন আমার সঙ্গে।"

আদেশও নয়, অনুরোধও নয়। পার্বতীশঙ্করের সেই আহ্বানে কেমন যেন একটু আলাদা ধরনের সুর ফুটে উঠল।

সেই সুরটিকে অগ্রাহ্য করা বিজয়ার পক্ষে সম্ভব হল না। ছেলের হাত ধরে ঠাকুর মশায়ের পেছন পেছন মন্দির এলাকা থেকে বেরিয়ে এল।

একটিবার পেছন ফিরে তাকালেন না ঠাকুর মশাই, ভিড় ঠেলে সোজা চলতে লাগলেন। মন্দিরের পেছন দিক দিয়ে একটা পথ গেছে গ্রামের দিকে, সেই পথে ঢুকে পার্বতীশঙ্কর বললেন—"সাবধানে এস, পা পিছলাতে পারে।"

সাবধানেই ওরা মা-বেটা হাত-ধরাধরি করে পা ফেলতে লাগল।

মৌসুম তখন ভাবছে কোথায় চলেছে তারা। যা ভাবছে তা মুখে প্রকাশ করল না। বাঘের বাচ্চা, সহজে কাবু হয় না।

নির্জন অন্ধকার-পথে মিনিট পনেরো চলবার পর পার্বতীশঙ্কর মুখ খুললেন। অন্ধকারের মধ্যে কাকে যেন ডাক দিলেন—"উমা, উমা!"

একটু পরে আলো দেখা গেল। হ্যারিকেন হাতে নিয়ে ওঁর মেজভাই উমাশঙ্কর মাটি ফুঁড়ে উদয় হলেন।

তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে পা চালালেন পার্বতীশঙ্কর, আবার তাঁকে মন্দিরে যেতে হবে।

এইবার বিজয়া কথা বলল—"কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

সঙ্গে সঙ্গে উমাশঙ্কর জবাব দিলেন—"অহিদার কাছে। অনেকক্ষণ উনি বসে আছেন আপনাদের জন্যে।"

টুঁ শব্দ বেরুলো না আর বিজয়ার মুখ থেকে, মৌসুম বেশ শব্দ করে তার আটকানো দমটা ছাড়লে।

উমাশঙ্কর বললেন—"মাথা নিচু করুন, সাবধানে উঠুন দাওয়ায়, চাল খুব নিচু।"

মিনিটখানেক পরে যে ঘরে ঢুকল ওরা সেটা বোধ হয় ছাগলের খোঁয়াড়। দুর্গন্ধে দম আটকে এল মৌসুমের। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল দু'হাতে তাকে জাপটে ধরেছে কে। কে আবার ধরবে, বাবা—তার বাবা, বাবার গায়ের গন্ধ মৌসুম বুঝতে পারে।

হ্যারিকেনটা রেখে দিয়ে দরজার বাইরে চলে গেলেন উমাশঙ্কর। সেখান থেকে চাপা গলায় বললেন—“আমি চললাম, ঘণ্টাখানেক পরে আসব। দুধ মিষ্টি রইল, বৌদিকে আর ছেলেটাকে খাওয়াবেন দাদা, ভুলে যাবেন না।”

অহিভূষণ সান্যাল, যার নামে দুটো জেলার যাবতীয় চোর-বাটপাড়, কালোবাজারী আর রক্তচোষা জোতদার থরথর করে কাঁপে, সেই ব্যক্তি নিজে তখন ছেলেকে বুকে চেপে ধরে কাঁপছে।

বেচারী বিজয়া ওদের বাপ-ছেলের পায়ের কাছে ছাগল-লাদির উপরেই বসে পড়ল।

মানুষের শরীর তো।

হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল আকাশ। ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি মাথায় করে আলের ওপর দিয়ে হন্-হন্ করে হেঁটে চলেছেন উমাশঙ্কর ঠাকুর। ঝড়, জল, বজ্রাঘাত উনি টের পান না। অন্ধকারে ওঁর চোখ জ্বলে।

সাচ্চা দরবারের এলাকা ছাড়িয়ে গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন উমাশঙ্কর ঠাকুর। গ্রামেও ভিড়, প্রতি বাড়িতেই আত্মীয়-কুটুম জমা হয়েছে। মেলার সময় সবাই আত্মীয়-কুটুমদের নেমন্তন্ন করে।

তখনও জেগে আছে গ্রাম। একটা টিনের চালের বাড়িতে গ্রামোফোন বাজছে।

উমাশঙ্কর ভিজতে ভিজতে গিয়ে সেই বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। দরজা খুলে ওঁকে ভেতরে নিয়ে গেল একটি ছোক্‌রা।

একটা ঘরে ফুর্তিসে খাওয়া-দাওয়া চলছে। অত রাত্রে ভাত-রুটি জোটেনি—মুড়ি, কলা, শশা, নারকেল আর মেলার সন্দেশ, রসগোল্লা।

ভিজে জামাকাপড়সুদ্ধ উমাশঙ্কর ওদের মাঝখানে গিয়ে বসে পড়লেন।

সেই শিখ ড্রাইভারটিকে তখন চেনাই যায় না। গোঁফ-দাড়ি পাগড়ি বিলকুল উধাও। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আমিরী চালে বসেছে সে দুটো বালিশ কোলে নিয়ে।

সেই আদর্শ বাঙালীটি এক কোণে আলাদা হয়ে বসে চোখ বুজে মুড়ি চর্বণ করছেন। আরও জনা-পাঁচেক যুবক খাদ্যদ্রব্যগুলো ঘিরে বসে চাপা গলায় কি যেন পরামর্শ করছে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে জয়া পরিবেশন করছে। উমাশঙ্করের সামনে একখানা শালপাতা পেতে দিয়ে জয়া চারটি মুড়ি তুলে দিলে। উমাশঙ্কর বাধা দিলেন, কিছুই তিনি খেতে পারবেন না।

জয়া ফোঁস করে উঠল—"কেন খাবেন না? সবাই আমরা খাচ্ছি?"

মুড়ি চর্বণ বন্ধ করে স্বস্তিকবাবু বললেন—"অপহৃতা

স্ত্রীলোকের হাতে খায় কি করে বেচারা, হাজার হোক সাচ্চা দরবারের পাণ্ডা !”

“কিন্তু ধর্ষিতা নয়।” সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল কৌশিক।

ছেলেরা হো-হো শব্দে হেসে উঠল। লাল হয়ে উঠল জয়ার মুখ। রেগে গেছে সে। উমাশঙ্করকেই সাক্ষী মানল—“দেখলেন তো ব্যাপারটা! রাজী হয়ে গেলাম আমি কিনা, তাই এখন বোলচাল ঝাড়া হচ্ছে। আমি যদি রাজী না হতাম, তা'হলে দেখতাম সবায়ের কেরামতি। ডাকাতি করে একটা মেয়েকে গাড়িতে তোলা বেরিয়ে যেত। কোন্ মেয়ে রাজী হত শুনি ?”

উমাশঙ্কর বললেন—“কান দিচ্ছ কেন লোকের কথায়, বলুক না যার যা খুশি হয়, গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ছে না।”

কৌশিক বলল—“হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে রেখে দোব বেশী কথা বললে, মনে থাকে যেন। ডাকাতি করে ধরে এনেছি।”

স্বস্তিকবাবু সায় দিলেন—“তাই উচিত। কিন্তু সেটা ঘটছে সামনের অঘ্রাণ মাসের প্রথম দিকে। ডাকাতিটাকে শাস্ত্রসম্মত করতে হবে তো ? শাঁখ বাজবে, উলু দেওয়া হবে, আমরা সবাই লুচি পোলাও খাব। তারপর তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে কে কার হাত-পা-মুখ বাঁধবে তা আমরা দেখতে যাব না। এখন যা জুটেছে তাড়াতাড়ি গিলে নাও।

ভোর হয়ে এল।”

জয়া কৌশিককেই জিজ্ঞাসা করল—“আবার কোথাও যেতে হবে নাকি ?”

কৌশিক শান্ত গলায় বলল—“দিদিকে আর মৌসুমকে নিয়ে ফিরে যাবে তুমি। অহিদাকে নিয়ে আমি সরে পড়ব।”

ঘরসুদ্ধ মানুষ চুপ করে রইল। হাসি-ঠাট্টা হঠাৎ উবে গেল যেন। মুখ নিচু করে রইল জয়া। স্বস্তিকবাবু শুধু নির্বিকারভাবে মুড়ি চিবিয়ে চললেন।

ছোট ঘরখানার ভেতরে জয়ার অনুক্ত প্রশ্নটা আবার রূপ ধরে পাক খেতে লাগল, প্রত্যেকেই বুঝতে পারল জয়া যা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছে কৌশিককে। প্রশ্নটি হল—“আবার কবে দেখা হবে ?”

॥ ৮ ॥

শুরু হল পূর্ণিমার ভিড় ত্রয়োদশীর দিন বিকেল থেকে। যারা আসছে তারা থেকে যাবে দু’দিন, জল আগলে বসে থাকবে। পূর্ণিমার দিন সকালে জল চড়িয়ে ফিরবে।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় বোম্ ভোলের মাথায় জল ঢাললে অনন্ত পুণ্য, ঐ দিনটি নাকি ভোলানাথের সব চেয়ে প্রিয় দিন, ঐ দিন যে বাবার মাথায় জল ঢালতে পারবে বাবা তার অনন্ত

দুঃখ দূর করবেন।

দুঃখী মানুষরাই আসছে। শহরের পথে যারা রিক্‌শা টানে, মাল টানে, ইঁটের নৌকায় যারা ইঁট বোঝাই করে, যারা হাটেবাজারে রেলস্টেশনে মোট বয়, যারা ফিরিওয়ালা, যারা গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি চালায়, যারা ফুটপাথে শুয়ে রাত কাটায় তারা সবাই আসছে তাদের অনন্ত দুঃখের পসরা নিয়ে। গঙ্গাজলের সঙ্গে বুকভাঙা হাহাকার মিশিয়ে তারা আশুতোষকে স্নান করাবে।

কণ্ঠে যিনি হলাহল ধারণ করে আছেন, তিনিই পারেন মানুষের অনন্ত দুঃখ মাথা পেতে নিতে। দুঃখের বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে যাবে সবাই। ফিরে গিয়ে নব উদ্যমে আবার দুঃখের সঙ্গে লড়বে।

এলেন সরকার মশাই। ফি-বছর উনি আসেন শ্রাবণী পূর্ণিমায়।

উৎকট রোগ আছে ভদ্রলোকের পেটের মধ্যে। যা খান বমি করে ফেলেন। বমি করেও রেহাই নেই, বমির পরেই শুরু হয় ব্যথা। সে এক দুর্দান্ত ব্যাপার। তখন সরকার মশাইকে দেখলে মনে হয়, দুটো অদৃশ্য শয়তান তাদের অদৃশ্য হাত দিয়ে গামছা নিঙড়াবার মত করে নিঙড়াচ্ছে যেন ওঁকে।

পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়িতে ঘা হয়ে গেছে। ব্যথা কিন্তু কমেনি। মাস-ছয়েক ঠাণ্ডা থেকে দ্বিগুণ বিক্রমে

চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

সর্বশেষে বাবার থানে এসে পড়েছেন সরকার মশায়ের দিদি ষষ্ঠীঠাকরুণ, ভায়ের জন্যে তিনি ধন্না দিয়ে ওষুধ পেয়েছিলেন। ওষুধ দিয়ে বাবা আদেশ করেছিলেন ফি-বছর শ্রাবণী পূর্ণিমায় খোদ সরকার মশাইকে আসতে হবে। দিদির সঙ্গে সরকার মশাইও আসতে শুরু করেছেন। এইবার নিয়ে পাঁচ বছর ওঁদের আসা হল।

তা বাবার দয়ায় এখন বলতে গেলে ভালই আছেন। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক তিনটে মাস তো ভাল থাকেনই, অঘ্রাণ মাসে শীতের হাওয়া বইতে শুরু করলেই গোলমাল বাধে। মাঝে-মধ্যে ব্যথাটা মাথাঝাড়া দেয়। তবে তেমন নয়, সেই গামছা নিঙড়াবার মত করে এখন আর কেউ ওঁকে নিঙড়ায় না। নিঙড়ালেই বা পাবে কি, নিঙড়াতে নিঙড়াতে একদম ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছে সরকার মশাইকে, এখন নিঙড়ালেও এক ফোঁটা রস বেরুবে না।

তবে হাঁ, রস আছে যথেষ্ট সরকার মশায়ের পরিবারের। পরিবারটি তৃতীয় পক্ষের, তৃতীয় পরিবার তাঁর দুই বোন ঝর্ঝরি আর শিঞ্জিনীকে সঙ্গে নিয়ে সরকার মশায়ের সঙ্গে এসেছেন। আর এসেছে সুজয়, বিভাস, প্লাটিনাম, বকরাক্ষস।

ওরা আসবেই। সরকার মশায়ের পরিবার মুরলী দেবী যেখানে যান ওরা সঙ্গে যায়।

কথা হচ্ছে ভুজঙ্গ সরকারের পরিবার দেবী হলেন কি

করে? হলেন অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবগুলোর দৌলতে। মুরলী সরকার যেদিন থিয়েটারে নামলেন সেদিন হয়ে গেলেন দেবী। দেব-দেবী ছাড়া সাধারণ জীব কি থিয়েটারে নামতে পারে!

তা মুরলী দেবী নাম করেছেন থিয়েটার করে। অ্যামেচার পার্টিতে মেয়েরা পার্ট করেন পয়সা নিয়ে, পয়সা নিয়ে পার্ট করলেও তাঁদের অ্যামেচারত্ব ঠিক বজায় থাকে; ভুজঙ্গ সরকারের পরিবার পয়সা তো নেনই না, উপরন্তু বিশ-পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দেন।

চাঁদাই শুধু দেন না, নিজের দুই বোন ঝর্ঝরি আর শিঞ্জিনীকেও সঙ্গে নিয়ে যান। কোথাও তারা পার্ট পায়, কোথাও পায় না। থিয়েটারের আগে ছোটখাটো একটু ফাঙ্‌শনের ব্যবস্থা করতে পারলেই হল। ফাঙ্‌শনে মুরলী দেবীর দুই বোন নৃত্য করেন, অজন্তা প্যাটার্নের সাঁওতালী নৃত্য। নৃত্য দেখে মানুষে বাহবা দেয়, মুরলী দেবী সন্তুষ্ট হন।

চাঁদা পেতে হলে ওঁকে সন্তুষ্ট করা চাই। তা ছাড়া চাঁদা দেবার ক্ষমতা কটা লোকেরই বা আছে?

মুরলী দেবীর আছে চাঁদা দেবার ক্ষমতা। জাঁদরেল একখানা রেশনের দোকান চলছে মুরলী দেবীর নামে।

বিঘোষণ ঘোষ হলেন সেই দোকানের ম্যানেজার। ভুজঙ্গ সরকার নিজে বিঘোষণকে কাজ শিখিয়েছেন।

দোকানের সামনেটা ঝাড়ু দিলে এক সরা মাল পাওয়া যায়, এক সরা বালি ধুলো কাঁকরের ওজন 'কম-সে-কম' এক কেজি। নতুন গমের বস্তা বা চালের বস্তাটা খুলে এক সরা করে ঐ মাল যদি বস্তায় ফেলা যায় তা হলে এক কেজি ওজনে বাড়ে। দু সরা করে ফেললে দু কেজি বাড়ে।

তারপর ধর, চিনির বস্তাটা খুলেই এক মগ জল ফেলে দিলে বস্তায়। মাত্তর এক মগ, এক মগ জল এক বস্তা চিনির মধ্যে ঢেলে দিলে কি চিনি সব ভিজে যাবে? কিছুতেই নয়। অথচ মাল তো এক কেজি বাড়ল।

আচ্ছা, হিসেব কর বস্তা-পিছু দু কেজি করে মাল বাড়লে কি দাঁড়ায়; হেসে-খেলে দুটো করে টাকা তো দাঁড়িয়েই যায়। একশ' বস্তা চাল, একশ' বস্তা গম, পঁচিশ বস্তা চিনিতে তা'হলে কত দাঁড়াবে?

বিঘোষণ ঘোষকে হাত ধরে কাজ শিখিয়েছেন ভুজঙ্গ সরকার।

তখন অবশ্য ওঁর পেটে ঐ দুর্দান্ত রোগটা বাসা বাঁধেনি, নিজেই দোকানে বসতেন।

এখন মাসে দশটা দিনও দোকানে যেতে পারেন না, বিঘোষণ দোকান চালায়। ভালই চালাচ্ছে।

ভাল ভাবে না চালালে মুরলী দেবী এবং তাঁর দুই বোনের অত শাড়ী ব্লাউজ জুতোর দাম আসছে কোথা থেকে? অত টাকা চাঁদাই বা দেন কি করে মুরলী দেবী

অ্যামেচার ক্লাবে ?

ভুজঙ্গ সরকার মশাই ওঠেন মান্ধাতা ঠাকুরের আশ্রয়ে। মান্ধাতা এখন চোখেতে দেখতে পান না, ওঁর ভাই সঙ্কটমোচন ঠাকুর-যাত্রী-যজমানদের সামলান।

দুখানি ঘর নিতে হল, একটিতে থাকবেন সরকার মশাই আর তাঁর দিদি, আর একটিতে থাকবেন মুরলী দেবী দুই বোন নিয়ে। সুজয়, বিভাস, প্লাটিনাম থাকবে ঘরের সামনে দাওয়ায়।

বকরাক্ষস যেখানে হোক পড়ে থাকবে।

বকরাক্ষস হল সরকার মশায়ের নিজের চাকর, লোকটি বাগ্‌দী। একটি বিশেষ গুণের অধিকারী সে, জ্যান্ত পাঁঠা কামড়ে খেতে পারে। এক ফাঙ্‌শন্‌ওয়ালারা বকরাক্ষসকে দিয়ে ঐ বীভৎস শো-টি দেখাতে গিয়েছিল, ফলে মাসখানেক বককে জেল খেটে আসতে হয়। তারপর থেকে জ্যান্ত পাঁঠা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে, সুবিধে পেলে কেজিখানেক খাসির মাংস কাঁচা খেয়ে ফেলে।

বককে সরকার মশাই সঙ্গে রাখেন, দরকার পড়লে বক লাঠি হাঁকড়ে বিশ-পঞ্চাশটা লোককে খতম করে দিতে পারে।

অত্যধিক পরিমাণে ধুলো-বালি-কাঁকর মেশানো চাল-গম দেওয়ার দরুন একবার শতখানেক মানুষ সরকার মশায়ের দোকান লুটতে গিয়েছিল। বকের জন্যে কিছুই করতে পারেনি। জনা-দশেককে চলে যেতে হয় হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তারা জেলে গিয়ে ঢোকে। সরকার মশাই তাঁর দোকান লুট হয়েছে বলে নালিশ ঠোকেন।

আর একটা কাজও করে বক, সরকার মশায়ের পরিবারদের সরকার মশায়ের হুকুমে বক পেটাত। বক যখন পেটাত, সরকার মশাই তখন সামনে বসে মজা দেখতেন।

পিটুনির চোটে এক পরিবার ভাগল, আর একজন গলায় দড়ি দিলে।

তারপর এলেন মুরলী দেবী, এসেই কি মন্ত্রে যে বককে ভেড়া বানালেন কে জানে। এখন বক সরকার মশায়ের চেয়ে মুরলী দেবীকে বেশী শ্রদ্ধা-ভক্তি করে।

মাঝে-মধ্যে মুরলী দেবী বককে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে শলা-পরামর্শ করেন। বকরাক্ষস ঠাণ্ডা থাকে।

সরকার মশাই এখন উল্টো চিন্তা করেন, মুরলী দেবীর হুকুমে বক যদি একদিন তাঁকে ধরে পেটাতে শুরু করে! সে সম্ভাবনা অবশ্য একেবারেই নেই, মুরলী দেবীর স্বামীভক্তি একটা দেখবার মত ব্যাপার।

স্বামীর আদেশ না নিয়ে তিনি ঘর থেকে এক পা বাড়ান না।

যাক্, ঐ ভিড়ে ঘর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন সরকার মশাই। ঘর অবশ্য পেতেনই, মান্ধাতা ঠাকুরের পুরনো যজমান তাঁরা, ফি-বছর আসছেন, ঘর পাবেন না মানে!

বাবার মাথায় জল চড়ানো, পূজো দেওয়া সবই সমাধা হল সুশৃঙ্খলে। তিন রাত থাকবেন ওরা, পূর্ণিমার পর যাবেন। প্রথম রাতটি ভালয়-ভালয় কাটল।

॥ ৯ ॥

চতুর্দশী। নড়ে-চড়ে হেঁটে-চলে বেড়াবার স্থানটুকুও নেই সাচ্চা দরবারে। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না। কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না মেলায়, সন্দেশ-রসগোল্লা নেই, তেলেভাজা নেই, মায় মুড়ি-চিঁড়ে পর্যন্ত খতম।

বাবার ভোগ চড়াবার জন্যে চিনির ডেলা কিনতে গেলে টাকায় পাঁচটা করে পাওয়া যাচ্ছে।

হোটেল বন্ধ করে দিয়ে হরতন ভেগেছে, তার সেই কলেজ গার্ল-মার্কা মেয়েমানুষ তিনটেকে পাকড়ে নিয়ে গেছেন কোল্ড-স্টোরেজের ম্যানেজার ভোঁতা ভাদুড়ী, তাদের দিয়ে বোধ হয় ভাদুড়ী মশাই পচা আলু বাছাবেন।

পান-বেচা মুলতুবী রেখে বালাখানা মদ বেচছে। বারো আনা করে গ্লাস।

মালসী বাড়িউলী তার মেয়ে রোহিলাকে নিয়ে বালাখানার দোকানে বসেছে।

অত মদ কোথা থেকে যে জোটাচ্ছে মালসী তা শুঁড়ীদের ভগবান শুঁড়ওয়ালা গণেশ ঠাকুরই জানেন।

বারো আনা করে গেলাস মদ বেচে বালাখানার চার আনা করে থাকছে। মালসী মাত্তর আট আনা করে নিচ্ছে বালাখানার কাছ থেকে। পান বেচার চেয়ে ঢের ভাল। চারশ' গেলাস মদ কাটাতে পারলে একশ'-টা টাকা থাকে।

তিনদিন তিনরাতে এক হাজার গেলাসেরও বেশী মদ বেচেছে বালাখানা। এখনও পূর্ণিমা প্রতিপদ বাকী। বোম্ ভোলের কৃপায় এবার বালাখানা হাজারখানেক টাকা তুলতে পারবে।

ভাগ্যে রোহিলাকে সে তার ইস্পিসাল জর্দা ধরাতে পেরেছিল। মালসী বাড়িউলী বড় জোর দশ বোতল মাল কাটাতে পারত তার বাড়িতে। মাত্তর পাঁচখানা ঘর, পাঁচখানা ঘরে পাঁচটা মেয়েমানুষের কাছে না হয় দশটা লোকই যেত। দশটা লোক গেলে দশ বোতল মদ কাটবে, তার বেশী তো আর কাটবে না।

রোহিলাকে ইস্পিশাল জর্দা ধরিয়ে একটি দামী পরামর্শ দিলে বালাখানা, মদের কারব্যরটা তার পানের দোকান থেকেই চলুক, রোহিলা তার মাকে রাজী করিয়ে ফেললে।

কোকেন দেওয়া জর্দা খাওয়ার দরুন রোহিলার মেজাজ একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা থেকে হা-পিত্যেশ করে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকাটা তার বরদাস্ত হচ্ছিল না। এখন সে রাণীর মত বালাখানার দোকানে বসে আছে, মানুষজনকে গ্রাহ্যই করছে না।

তবে আবগারির সেপাই দুটো রোজই একবার করে জ্বালায়। তারা এলে রোহিলাকে দোকান থেকে উঠে যেতে হয়। কি করা যাবে, আবগারি কিনা।

কোমরের ব্যথা সেরে গেছে কোঁতকার। সেই মেম-সাহেবের ওপর রাগটাও পড়ে গেছে। ওপরের তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়েছেন চন্দ্রচূড় ভৌমিক।

তাঁর গুরুভাই হরসুখলালজী সাচ্চা দরবারের ভক্তদের সেওয়ার জন্যে পারম্যানেণ্ট সেওয়া সদন খুলেছেন। চোখের ডাক্তার আর দাঁত ওপড়াবার ডাক্তার সাচ্চা দরবারে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

মেলা শেষ হলে জমি কিনবেন চন্দ্রচূড়, বড় হাসপাতাল বানাবেন। বাবা জটিলেশ্বরের শিষ্যরা হাসপাতালের জন্যে চন্দ্রচূড়ের হাতে বহু টাকা দিয়ে গেছেন।

বড়ুয়া সাহেব চলে গেছেন। মণিকুন্তলা দেবীর ইচ্ছে ছিল মেলার শেষ পর্যন্ত থাকবার। বড়ুয়া সাহেবের বুকে কি যেন কি হল। মণিকুন্তলা আর এক বেলা অপেক্ষা করলেন না, তৎক্ষণাৎ স্বামীকে নিয়ে রওয়ানা হলেন শহরের দিকে।

হার্ট-স্পেশালিস্ট ডাক্তার রুদ্রকে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল প্রস্তুত থাকতে। বাবার থানে ধন্না দেওয়ার কথাটা মনের কোণেও উদয় হল না মণিকুন্তলা দেবীর। বাবা মাথায় থাকুন, ডাক্তার রুদ্র যদি অ্যালাউ করেন তা'হলে

কালবিলম্ব না করে স্বামীকে নিয়ে পালাবেন তিনি ভিয়েনায়।

সত্যিকারের হার্ট-স্পেশালিস্ট তো ভিয়েনাতেই আছে।

ভুজঙ্গ সরকার মশায়ের পরিবার মুরলী দেবী ভিয়েনার নামটাও বোধ হয় শোনেননি। কাজেই স্বামীকে নিয়ে পড়ে রইলেন তিনি সাচ্চা দরবারে।

উপায় কি, বকরাক্ষসকে নিয়ে তো আর ভিয়েনায় যাওয়া যায় না।

মনের আনন্দে রয়েছেন সরকার মশাই। চাল, ডাল, তেল, নুন থেকে শুরু করে কেরোসিনের স্টোভ্, কেরোসিন তেল, চা, বিস্কুট, পান, জর্দা সবই সঙ্গে এনেছেন। মেলার শেষ কটা দিন যে কি দুর্ভিক্ষ লাগে সাচ্চা দরবারে সেটা উনি বিলক্ষণ জানেন। এমন কি কলাপাতা শালপাতা পর্যন্ত মেলে না। অগত্যা কয়েকটা বাসনও আনতে হয়েছে।

ষষ্ঠী ঠাকরুণ রান্না করছেন, বকরাক্ষস বাসন ধুয়ে দিচ্ছে। দিব্যি চলছে। সুজয় আর বিভাস ঝর্ঝরি আর শিঞ্জিনীকে নিয়ে হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্লাটিনামকে কাছছাড়া করেন না মুরলী দেবী। ছেলেমানুষ, মাত্তর চোদ্দ-পনর বছর বয়েস, ঐ ভিড়ে যদি হারিয়ে যায়!

প্লাটিনাম ছোকরাটির রঙ প্লাটিনামের মত, বড্ড স্নেহ করেন তাকে মুরলী দেবী। নিজের হাতে তেল মাখিয়ে দেন, বাড়িতে স্নানও করিয়ে দেন নিজের হাতে, নিজের হাতেমুখে তুলে খাইয়ে তো দেনই। এমন কি নিজের বিছানায় পাশে

শুইয়ে ঘুমও পাড়ান।

হলে হবে কি, অত্যধিক আদর-যত্ন করার জন্যেই বোধ হয় প্লাটিনামের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে, চোয়াল উঁচু হয়ে উঠেছে, সর্বক্ষণ ঢুলু-ঢুলু অবস্থা।

ওর দশা দেখে ঝর্ঝরি আর শিঞ্জিনী হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলতে কিছু সাহস করে না, দিদি যদি খেপে গিয়ে খেদিয়ে দেয় তাহলে লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করে খেতে হবে।

দিদি অবশ্য সহজে খেপবে না। সরকার মশায়ের মেজাজ যখন ভাল থাকে তখন তিনি বোন দুটিকে সরকার মশায়ের কাছে রেখে প্লাটিনামকে নিয়ে মার্কেটিং করতে যান। সরকার মশাই শালীদের পাহারা দেন। সে-সময় সুজয়, বিভাসও বাড়িতে ঢুকতে পায় না। মানে খুবই কড়া মানুষ কিনা সরকার মশাই, ওঁর সামনে ওঁর শালীদের নিয়ে বাড়ির মধ্যে বেলেল্লাপনা করার সাহস হয় না ওদের।

কড়া শাসন বাড়িতেই চলে, সাচ্চা দরবারে কে কাকে শাসন করবে। তাই ঝর্ঝরি শিঞ্জিনী পুষিয়ে নিচ্ছে। সুজয় আর বিভাস ওদের নিয়ে কোথায় গিয়ে যে সারাদিন কাটাত কে জানে।

চতুর্দশীর সন্ধ্যা।

সন্ধ্যারতি দেখতে চলে গেলেন ষষ্ঠী ঠাক্‌রুণ ভাইটিকে নিয়ে। বিভাস আর সুজয়ের সঙ্গে ঝর্ঝরি আর শিঞ্জিনী গেল সিনেমা দেখতে। মুরলী দেবীর শরীরটা কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে। প্লাটিনাম ওঁর কাছেই রইল। ছেলেমানুষ তো, ঐ ভিড়ে কোথায় যাবে বাচ্চাটা, যদি হারিয়ে যায়!

হারিয়েই গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত।

ভয়ঙ্কর ভিড়ের মধ্যে মরীয়া হয়ে ছুটছে একটা ছোকরা। বিশ পা এগোতে পারল না, গুঁজড়ে পড়ল মানুষের পায়ের তলায়। থেঁতলে গেল একেবারে।

কি হল? কি হল?

কিছু লোক সংবিৎ ফিরে পেল। ভক্তির নেশাটা ছুটে গেলে কিছুক্ষণের জন্যে। কোনও রকমে ভিড় ঠেলে তোলা হল ছোকরাটিকে। পাশের রোয়াকে শোয়ানো হল।

কি হল ছোকরাটির? উলঙ্গ কেন? জামাকাপড় গেল কোথায়?

কি চমৎকার রঙ! আহা যেন রাজপুত্তুর!

দেখ, দেখ, বোধ হয় ভিরমি গেছে!

চিৎ করে শোওয়াও। জল দাও মুখে।

জল—জল আন না কেউ!

কি সর্বনাশ !

আলো—আলো—আলো দেখাও !

একজন টর্চ জ্বালালে। ফলে বিলকুল পরিষ্কার হয়ে গেল।

না, পরিষ্কার কিছুই বোঝা গেল না।

ছটফট করতে করতে নিথর হয়ে গেল রাজপুত্তুরটি। যাবেই, সর্বনাশ হয়ে গেছে কিনা। যেখানে পুরুষাঙ্গটি ছিল সেখানে কিচ্ছু নেই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সেখানটা। মনে হল, যেন ছিঁড়ে উপড়ে ফেলা হয়েছে। কিংবা কোনও কিছু দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আন্দাজ করা গেল ব্যাপারটা। ছোকরাটি নিজেই করেছে ঐ কাণ্ড। চিরকাল ব্রহ্মচারী থাকবার বাসনায় নিজেই নিজের বিশেষাঙ্গটিকে কেটে ফেলেছে। ও রকম ব্যাপার আগেও নাকি ঘটেছে বাবার থানে। একবার এক নাগা বাবার চেলাও নিজের হাতে বিসর্জন দিয়েছিল নিজের লিঙ্গ। অবশ্য প্রাণটাও গেল সেই সঙ্গে। তা যাক, কামের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াটাই আসল কথা। এঁড়ে ম'ল, এঁড়ের ঘায়ের পোকাও ম'ল।

আহা !

রাজপুত্তুরের মত ছেলে, কোন্ মায়ের কোল খালি করে—

তারপর আর সময় নেই কারও।

ওধারে সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেল বাবার। চতুর্দশীর

রাতে বাবার সামনে ঝুলনের গান হবে। শ্রীধাম থেকে ভয়ানক নামকরা কীর্তনের দল এসেছে। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল ভোলানাথ গান শুনবেন—ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায়। চল চল, তাড়াতাড়ি চল, একটু জায়গা পাওয়া চাই।

ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায়।

মস্ত বড় চাঁদখানা দুধপুকুরের জলে থরথর করে কাঁপছে। এক দঙ্গল দামাল মেঘ দারুণ হট্টগোল বাধিয়েছে চাঁদের সামনে। সাদা রঙ ওদের, পেঁজা তুলোর মত দেহ। মুশকিল হচ্ছে, কোনটাকে কেমন দেখতে বোঝবার উপায় নেই। জড়াজড়ি করতে করতে কখনও হয়ে যাচ্ছে হাতির মত, কখনও হচ্ছে কুমীরের মত। ঢাকা পড়ছে চাঁদের মুখ। ওদের খেলা দেখে চাঁদ হাসছে।

হাসছেন ভুজঙ্গ সরকার মশাইও। হো হো করে হাসছেন না, ক্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে হাসছেন। কেমন যেন প্রেতের হাসির মত মনে হচ্ছে ওঁর হাসিটা। ভুজঙ্গ সরকার মশাই হাসছেন চিবোনো দেখে।

চিবোচ্ছে বকরাক্ষস, কচকচ করে চিবোচ্ছে। পরম নিশ্চিন্ত হয়ে চিবোচ্ছে। বকরাক্ষসও হাসছে, যেমন ভাবে হাসত ফাঙ্‌শন্‌ওয়ালাদের ফাঙ্‌শনে জ্যান্ত পাঁঠা কামড়ে খেতে খেতে। জ্যান্ত পাঁঠা নয়, সত্যিকারের মানুষের মাংস

চিবোচ্ছে বক, তাজা মানুষের মাংস। প্লাটিনামের অঙ্গ থেকে যে অংশটুকু খোয়া গিয়েছে সেটা তখন বকরাক্ষসের মুখে। বকরাক্ষসের মুখময় রক্ত, চোখ-ভুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তবু কিন্তু হাসছে সে, চিবোতে চিবোতে হাসছে। হাসিটা দমকে দমকে তার ভেতর থেকে ঠেলে বেরুচ্ছে।

ভুজঙ্গ সরকার মশাই ঠিক আগের মত ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে হাসছেন, ঠিক ঐভাবেই তিনি হাসতেন যখন বক তাঁরই হুকুমে তাঁর আগের পরিবারদের ধরে পেটাত। পিটুনির চোটে প্রথম পরিবারটি ভাগে, দ্বিতীয় পরিবারটি গলায় দড়ি দেয়। তারপর তো মুরলী দেবী এসে বককে জাতুমন্ত্রে বশ করে ফেললেন। সরকার মশাই হাসবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। পরিবার পেটানো না দেখলে তাঁর হাসি পায় না। বহুদিন পরে তিনি হাসবার সুযোগ পেয়েছেন, হাসবেন না কেন।

মারধর করছে না অবশ্য বক। মারধর করতে যাবে কেন থামকা। মুরলী দেবীর হুকুমে সরকার মশাইকে হয়তো পেটাতে পারে একদিন। সেদিন কি আর আসবে!

সরকার মশাই দেখছেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। শিবের বুকে শক্তি নয়, শক্তির বুকে শিব। বকরাক্ষস মুরলী দেবীর বুকের ওপর চেপে বসে আছে। আর মনের আনন্দে কচকচ করে চিবিয়ে চলেছে প্লাটিনামের মাংস।

মুরলী দেবী তখনও প্রাণপণে চেষ্টা করছেন মুক্তি পাবার।

দু'হাতে আঁচড়াচ্ছেন খামচাচ্ছেন বকরাক্ষসের বুকটা। কে গ্রাহ্য করে, ফাঙ্শন হচ্ছে ফাঙ্শন্, ফাঙ্শনে শো দেখাচ্ছে বক, নির্বিকার চিত্তে চিবিয়েই চলল।

খানিকটা গোলমাল হল বইকি।

বেধড়ক ঠেঙানি খেয়ে শেষ পর্যন্ত বকরাক্ষস ভাগল। তারপর সবই চাপা পড়ে গেল হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে। সরকার মশাইকেও আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই রাতেই ঝর্ঝরি-শিঞ্জিনীকে নিয়ে মুরলী দেবী উধাও হয়ে গেলেন। প্লাটিনামের বেওয়ারিশ লাশটার কি হল কে তার খবর রাখে!

শেষ হল মেলা।

এবারের মত খেল্ খতম। দোকানপসার সব উঠে গেল দিন-তিনেকের ভেতর। নয়ত চার দিন থেকে আবার ভাড়া গুনে মরতে হবে। বাঁশের খোঁটাগুলোকে উপড়ে নিয়ে গেল ওরা। রইল শুধু অগুণতি গর্ত। বৃষ্টি তখনও একেবারে কমেনি, তাই গর্তগুলো ভরতি হয়ে গেল আকাশের জলে। তারপর তাতে জীব জন্মগ্রহণ করলে। অসংখ্য বেঙাচি লেজ নেড়ে খেলা করতে লাগল।

তখন শুরু হল হিসেব।

হিসেবের প্রথমেই সেই সার্কাসওয়ালার কথা উঠল। আহা রে, বেচারা পথে বসল একেবারে। ধুঁকতে ধুঁকতে

মরে গেল বাঘটা। অগত্যা ছেঁড়া তাঁবুটাকে নগদ কুড়ি টাকায় বিক্রি করে দিলে লোকটা লটারির টিকিটওয়ালা বাচ্চু ঘড়াইকে। বাচ্চু ঘড়াই সেই তাঁবু খাটাবে এবারে মেলায় মেলায়।

লটারির টিকিট বেচতে বেচতে লাল হয়ে গেল বাচ্চু। আগে একটা টিনের চোঙা মুখে দিয়ে পরিত্রাহি চিল্লাত, এখন কাঁধে ঝোলানো লাউড্ স্পীকার কিনেছে। তাঁবুটা কিনলে আপিস করবার জন্যে। লটারির টিকিট বেচবার জন্যে আপিস না খোলা পর্যন্ত বাচ্চু থামবে না।

বাচ্চুর কথা হচ্ছে না, সার্কাসওয়ালার বরাতের কথা হচ্ছে। ভাগ্যে পার্ব্বতীশঙ্কর মরা বাঘটা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনে নিলেন নয়ত ঐ তাঁবু-বেচা বিশটি টাকা নিয়েই সার্কাস-ওয়ালাকে বিদেয় হতে হত।

পার্ব্বতীশঙ্করের এক বড়লোক যজমান তাঁর ঢাউস গাড়ির পেছনে ভরে বাঘটাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়, সেখানে ওর ছালখানা ট্যান্ করানো হবে। কম-সে-কম শ'চারেক টাকা লাগবে ট্যান্ করিয়ে দামী সিল্কের কাপড় দিয়ে পেছনটা ঢাকতে।

লাগে লাগুক। তারপর সেই ছাল ফিরে আসবে সাচ্চা দরবারে। চড়বে বাবার ঘাড়ে। রাত্রে রাজবেশ করার সময় ছালখানিকে এমন ভাবে জড়িয়ে দেবেন পার্বতীশঙ্কর বাবার গায়ে যে মনে হবে সত্যিসত্যিই হরপার্ব্বতী পাশাপাশি বসে

আছেন কৈলাস শিখরে।

দেখে ভক্তরা হাততালি দিয়ে গান ধরবে—ওঁ হর হর হর মহাদেও।

মোদ্দা এটা ঠিক যে, বাঘটার ব্যাঘ্রজন্ম সার্থক হল। ডুবল বেচারা সার্কাসওয়ালাটা, তা আর কি করা যাবে।

সার্কাসওয়ালার বাঘটার মত যাত্রাওয়ালাদের সেই অভিনেত্রী বৃহন্নলার কপালও খুলে গেল। রাতের পর রাত মুখে রঙ মেখে শত শত জোড়া ক্ষুধার্ত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে বেশরম নেকাপনা করার চেয়ে সাচ্চা দরবারের পুণ্যবান তীর্থযাত্রীদের সেবা করা অনেক পুণ্যের কাজ।

চেষ্টাচরিত্র করে বালাই বৃহন্নলার জন্যে একটা কাজ জোটালে। চণ্ডেশ্বর ঠাকুর অব্যর্থ ঋতুবন্ধ নাশক ওষুধ বিতরণ করতে করতে তিনতলা যাত্রীনিবাস হাঁকড়ে ফেলেছেন।

বেশ কইয়ে-বলিয়ে বিশ্বাসী একজনকে খুঁজছিলেন ঠাকুমশাই তাঁর যাত্রীনিবাস চালাবার জন্যে। ঝাড়ু দেওয়া বা এঁটো ফেলা গোছের ছোট কাজ করতে হবে না তাকে, সেজন্যে আলাদা দুটো পাটকরুণী আছে। করতে হবে যা তার নাম তদ্‌বির-তদারক। দেশ-বিদেশের বড় মানুষরাও আসেন চণ্ডেশ্বরের যাত্রীনিবাসে। তাঁদের সন্তুষ্ট করা চাই। অনেকটা এয়ার হোস্‌টেসের মত কাজ, যাত্রীদের মেজাজ বুঝে চলতে হবে।

তা বৃহন্নলা চালাতে লাগল যাত্রীনিবাস সদাপটে। বালাইয়েরও একটা হিল্লে লেগে গেল। হোটেলওয়ালার খেজমত খেটে মরতে হল না।

সত্যি কথা হল, হোটেলওয়ালা হরতনই চেয়েছিল বৃহন্নলাকে। হরতনের পরিবার আর শাশুড়ী বাদ সাধলে। মেলা ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে রোজ হামলা শুরু করলে তারা হোটেলে। তাড়াও কলেজ-গার্লদের, নয়ত আমরাই ওদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব।

শাশুড়ীর টাকায় হোটেল করেছে হরতন, শাশুড়ীকে ভয় না করলে চলে না। কলেজ-গার্লরা বিদেয় হল। তা বলে চন্দননগরের বাজারে ফিরে গেল না তারা, সাচ্চা দরবারের নারকেল বাগানে ঘর ভাড়া করলে। বৃহন্নলাকে রাখবার কথাটা একেবারে গিলে ফেললে হরতন।

বালাই তখন চণ্ডেশ্বরকে গিয়ে ধরে পড়ল। তা ভালই হল। হোটেলে থাকলে ছত্রিশ জাতের এঁটোকাঁটা ঘেঁটে মরতে হত। চণ্ডেশ্বরের যাত্রীনিবাসে এক গেলাস জলও কাউকে গড়িয়ে দিতে হবে না। স্রেফ মন যুগিয়ে চলতে হবে খানদানী যাত্রীদের। তীর্থস্থানে, সাচ্চা দরবারের মত মহা-তীর্থে এসে কেউ যেন মনমরা হয়ে না থাকেন। মনের শান্তিটাই আসল কথা কিনা।

মনের শান্তিটাই হল আসল মুনাফা। শ্রীচৌহানের মত সাচ্চা দরবারের তালেবর ভক্তরা মুনাফা ব্যাপারটি ভাল

ভাবে বোঝেন। টাকা জিনিসটা ঢালতে জানেন ওঁরা, টাকায় টাকা মুনাফা খিচতে পারেন। সে মুনাফায় আরো বহুত টাকা মুনাফা কামানো যায়। কিন্তু ঐ মনের শান্তি নামক মুনাফাটা টাকা দিয়ে কামানো যায় না।

সাচ্চা দরবারের ভোলে বোম বাবা কৃপা করলে মনের শান্তি মুনাফাও মেলে। অবশ্য সন্তর্পণ ঠাকুরের মত সহৃদয় ঠাকুর মশাই একটি কপাল জোরে মিলে যাওয়া চাই।

সন্তর্পণ ঠাকুর হিসেব করছেন। মেলা চুকে গেছে, এখন একটু হিসেবনিকেশ করতে বাধা নেই। খাঁদুর পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর মশাই।

খাঁদু তার বোনঝি আর ভাইঝিদের দেশে রেখে আসতে গেছে। কাপড় সায়া জুতো জামা একগাদা পেয়েছে মেয়েগুলো। সোনার গিল্টি করা গহনাও পেয়েছে রাশীকৃত। টাকা পেয়েছে কে কত তা খাঁদুই জানে। ওদের মা-বাপের কাছ থেকে যখন ওদের আনে খাঁদু তখন চুক্তি করে আনে। মাসখানেকের জন্যে চুক্তি করে। ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট, একেবারে আনকোরা-গুলোর দাম আরও একটু বেশী পড়ে। আর খাওয়া-দাওয়া জামা কাপড় জুতো সমস্ত ফ্রি। ওসব জিনিস ওরা এমনিই পায়। মানে বকশিশ পায়। সন্তুষ্ট হয়ে খদ্দেররা বকশিশ দেন। নগদ যা দেন তা খাঁদু নেয়। নিয়ে সন্তর্পণের কাছে জমা দেয়। মেলা মিটে গেলে সন্তর্পণ চুক্তির টাকাগুলো

মিটিয়ে দিয়ে থাঁতুর সঙ্গে দশ আনা ছ' আনা বখরা করেন। ন্যায্য পাওনা দশ আনা, কারণ ঘরগুলো তাঁর, যজমানরাও তাঁর। ছ' আনার বেশী থাঁতু পাবে কেন।

তা ছ' আনা বখরাতেই থাঁতু সন্তুষ্ট। সন্তর্পণের শ্রীচরণে ত্যাল মাখাতে মাখাতে জীবনটা কাটলেই হল। ব্রাহ্মণ মানুষ তায় আবার বাবার সেবায়েত, তাঁর সেবা করলে অক্ষয় স্বর্গবাসটা রোখে কে।

তবে ঘেন্নাও করে এখন একটু একটু। ভারী বিদ্‌কুটে গন্ধ বেরোয় আজকাল ঠাকুর মশায়ের বাঁ পায়ের ঘা থেকে। গোদটা যেন দিন দিন ফেটে যাচ্ছে। দগ্‌দগে ঘা, ঘায়ের ভেতর থেকে দলা দলা পচা মাংস ছেড়ে আসে। কোথা থেকে এক তেল জুটিয়েছেন ঠাকুর মশাই, সেই তেলে ভেজানো ন্যাকড়া চাপা দিতে হয় ঘায়ের ওপর। গন্ধ কিন্তু ছড়ায়। একেবারে গরুপচা গন্ধ ছড়ায়। মাঝে-মধ্যে এক-আধবার থাঁতুর মনে হয় পালিয়ে যাওয়াই উচিত। অনেকে তাকে পরামর্শ দেয় পালাতে। নয়ত সেও শেষ পর্যন্ত পচে গলে খসে মরবে। থাঁতুর সাহস হয় না ঠাকুরের সঙ্গে বেইমানি করতে। ব্রহ্মশাপ সাংঘাতিক ব্যাপার, ব্রহ্মশাপে শিরে সর্পাঘাতও হতে পারে। বিশেষতঃ বাবার থানে।

বাবার থানে শ্রাবণী পূর্ণিমার পর হিসেবনিকেশ চলতে থাকে। কয়েকটা দিন সাচ্চা দরবার ঝিমিয়ে পড়ে। আকাশ সাফ হয়ে যায়। দুধপুকুরের জল নীলবর্ণ ধারণ করে।

ভোলে বোম রোজ বারোটার সময় আহারাদি সম্পন্ন করেন। নতুন করে আবার চিনির ডেলা পাকানো শুরু হয়ে যায়। দেখতে দেখতে পূজো এসে পড়বে। পূজো, লক্ষ্মীপূজো, কালীপূজো—নাও না কেন কে কত নেবে! আবার একটা মাসখানেকের মেলা জমল বলে। এইবেলা সবাই তৈরী হয়ে নাও।

সাচ্চা দরবার!

পার্বতীশঙ্করের মেজভাই উমাশঙ্কর বলেন—"ঝুটা হায় বাবা, বিলকুল ঝুটা হায়। এই গ্রহটায় কোনও দরবার সাচ্চা নয়। সাচ্চা হচ্ছে শুধু ছ্যাঁচড়ামি আর তাঁদড়ামি। জন্মেছি এই সাচ্চা দরবারে, দেখতে দেখতে মরবার বয়েস হল। পাণ্ডার ছেলে, কত কি দেখলাম জীবনভোর, কত কি শুনলাম। দেহি দেহি আর দেহি, শুধুই হাহাকার। সাচ্চা দরবারের বাবার বাবার বাবাও এই আকাশ-ছোঁয়া খিদে মেটাতে পারবে না।"

জয়াকে নিয়ে মুশকিলে পড়ে গেছেন উমাশঙ্কর। ওকে লুকিয়ে রাখতে হবে। বিজয়া ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে বোনটিকে, সুতরাং বোন দিদির সঙ্গে ফিরতে পারে না। কৌশিক বলেছিল, দিদিকে আর মৌসুমকে নিয়ে ফিরে যেতে। সাতপাঁচ না ভেবেই

ওটা বলেছিল কৌশিক। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জয়ার ফেরা চলে না। জেরা করে করে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বেন কর্তারা জয়াকে হাতে পেলে। মাথাগরম জয়া কি বলে ফেলবে তার ঠিক কি। স্বস্তিকবাবু তাঁর নিজস্ব ঢঙে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের কায়দায় ঘোষণা করলেন যে জয়া এখন থাকুক কিছুদিন। কৌশিক ফিরে এলে জয়ার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

কোথায় তখন কৌশিক ?

কবে ফিরবে সে ?

কোথায় রেখে আসবে অহিদাকে ?

কাকে শুধোবে ? কে জবাব দেবে ?

অহিভূষণ সান্যাল উধাও হয়েছেন জেল থেকে, এইটুকুই সব চেয়ে বড় সংবাদ। আসমুদ্রহিমাচল চষে ফেলা হচ্ছে অহিভূষণ সান্যালের জন্যে। গণতন্ত্র উচ্ছন্নে যাবে যদি অহিভূষণ ধরা না পড়েন। স্বয়ং সরকার, মানে খাস গণতন্ত্রী সরকার গোপনে হুকুম দিয়েছেন অহিভূষণকে খতম করার জন্যে। জ্যান্ত হোক মরা হোক অহিভূষণকে চাই। নগদ পুরস্কার দশ হাজার টাকা। টাকাটা অবশ্য জনগণের ট্যাক্সের টাকা। জনগণের দুশমন অহিভূষণ। এত বড় স্পর্ধা ছিল লোকটার যে দেশ থেকে চোর বাটপাড় কালোবাজারী ভেজালদারদের দূর করতে চায়। বলি গণতন্ত্র কথাটার মানে কি! চোর বাটপাড় কালোবাজারী ঘুষখোর

ভেজালদাররা কি গণ নয়? যে তন্ত্রে সকলের স্বার্থ বজায় থাকে সেই তন্ত্রের নাম গণতন্ত্র। ব্যক্তি-স্বাধীনতা কাকে বলে? ঘুষ-ভেজাল-ধরাধরি চালাবার অবাধ স্বাধীনতার নাম ব্যক্তি-স্বাধীনতা। অহিভূষণ এই স্বাধীনতার শত্রু ছিলেন, সুতরাং তিনি গণতন্ত্রের শত্রু। ন্যায়বিচার করে গণতন্ত্রের শত্রুটিকে সাত বছরের জন্যে পিঁজরেয় পোরা হয়েছিল। পিঁজরে ভেঙে উড়ে গেছে চিড়িয়া। অবাধ উন্মুক্ত আকাশ, আকাশের মুখে গণতন্ত্রের ঘোমটা নেই। গণতন্ত্রী ঘোমটা টেনে আকাশ খেমটা নাচ নাচে না। কোথায় তাকে খুঁজে পাবে?

অনেকবার অনেকরকম কায়দা করে জয়া জিজ্ঞাসা করেছে উমাশঙ্করকে; কোথায় গেছেন অহিদা? উমাশঙ্কর জবাব দিতে পারেননি। গণতন্ত্রী সরকারের গুণ গেয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতে ওঠেনি জয়া, গণতন্ত্র বা বাটপাড়তন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে তার। প্রশ্নটা কোথায় গেছেন অহিদা নয়, অহিদাকে নিয়ে কোথায় গেছে কৌশিক!

মাটির তলার ঘরে বসে জপে চলেছেন পার্বতীশঙ্কর। কেউ ঢুকতে পায় না সেই ঘরে। অনেকে বলে ওখানে নাকি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। সেই আসনে বসে সাধনা করেন

উনি। তাই যা খুশী করতে পারেন, যা বলেন তাই ফলে। মুশকিল হচ্ছে, কথাই বলেন না কারো সঙ্গে। তা বলে মৌনীবাবা নন। বাঘেখেকোর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলেন। না বলে উপায় কি। বাখেখেকো যে অন্য কারও কথা শুনবে না। কেউ কিছু বললে আর রক্ষে নেই, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করবে, ডাকলে সাড়া দেবে না, উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এমন জায়গায় গিয়ে শোবে যে খুঁজে বার করা যাবে না। মানে ভয়ডর নেই তো। বছরখানেক যখন বয়েস তখন ওকে বাঘে ধরেছিল। মুখে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল মাইলখানেক তফাতে একটা ভাঙা মন্দিরের মধ্যে। পার্বতীশঙ্কর তখন সেই মন্দিরে বসে সারারাত জপ করতেন। সেই জায়গা টার নাম খানাকুল, খানাকুল কৃষ্ণনগর বললে অনেকে চিনবে। পার্বতীশঙ্করের আদিবাড়ি সেই খানাকুলে। এখন বাস্ হয়েছে, লোকে চোখ বুজে খানাকুল যায়। তখন খানাকুল থেকে তারকেশ্বর আসতে হলে আস্ত একটা দিন গরুর গাড়িতে কাটাতে হত। তারপর নদী পার হওয়াও চাট্টিখানির ব্যাপার ছিল না। খানাকুলে যায় এখন সবাই আদিকালের মন্দিরগুলো দেখতে। হুস্ করে চলে যায় বাসে চেপে, হুস্ করে ফিরে আসে। কল্পনাও করতে পারবে না কেউ, কি ভয়ানক জঙ্গল ছিল তখন খানাকুলে। জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা একটা মন্দিরে লুকিয়ে বসে জপ করতেন পার্বতীশঙ্কর। পালিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে,

দু'তিন দিন পরে ফিরে আসতেন। এক রাত্রে বিঘ্ন ঘটল। উঠে পড়তে হল জপ ছেড়ে। কি করে স্থির হয়ে থাকবেন, স্পষ্ট শুনতে পেলেন কিনা। হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন পার্বতীশঙ্কর ছোট ছেলের কান্না। মানুষের বাচ্চা, শকুনির বাচ্চা নয়। শকুনির বাচ্চা আর মানুষের বাচ্চা এক সুরেই কাঁদে। কিন্তু সে হাল দুধের বাচ্চা, বড় জোর মাস দুয়েকের বাচ্চা। ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদে শকুনি-বাচ্চার মত। তারপর দস্তুরমত মানুষের সুর বেরোয়।

হাতের কাছেই মশাল ছিল, চকমকি ছিল। চকমকি ঠুকে মশাল জ্বালিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পার্বতীশঙ্কর। একটুও দেরি হল না খুঁজে বার করতে। মস্ত একটা আনারসের ঝোপ, ঝোপটার পেছনে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। বাঘ নয়, একটা বাঘিনী বসে আছে উবু হয়ে। আর ঠিক তার সামনেই পড়ে আছে একটা বছর খানেকের বাচ্চা। মশালটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বাঘিনী। তারপর মুখ নামিয়ে নিজের কাজে মন দিলে। পার্বতীশঙ্কর পাথরের মত দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। কি দেখলেন ? যা দেখলেন তা কেউ চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবে না। বাঘিনী বাচ্চাটার মুখ চাটছে। বাচ্চাটা চেঁচাচ্ছে সমানে, বাঘিনীও তার মুখটা চেটে দিচ্ছে খুব আলতোভাবে। বারকতক চাটবার পর বাঘিনী আবার মুখ তুলে তাকাল মশালটার দিকে। কি রকম একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে তখন বাঘিনীর পেটের ভেতর

থেকে। তারপর আর সে বাচ্চাটার পানে তাকাল না। পেছন ফিরে আস্তে আস্তে চলে গেল।

পার্বতীশঙ্কর বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে পালালেন।

সেই রাতেই ফিরে এলেন বাড়িতে। হৈ-চৈ লেগে গেল গ্রামে। মেয়ে-পুরুষ বিস্তর মানুষ দেখতে এল। এলেন পার্বতীশঙ্করের ইষ্টগুরু বাচস্পতি মশাই। একশ' আটবার ভৈরব মন্ত্র জপ করে দিলেন বাচ্চার মাথায়। সুরধুনী ঠাকরুণ তখন বেঁচে ছিলেন। সেই রাতেই জঙ্গলহাঁটকে কতকগুলো শেকরবাকড় নিয়ে এসে শিলে বেটে লাগিয়ে দিলেন বাচ্চাটার মুখে-মাথায়। বাঘিনী বাচ্চাটার মুণ্ডটা নিজের মুখের মধ্যে পুরে নিয়ে গিয়েছিল। তাই তার কপালে গালে আর মাথার পেছন দিকে কয়েকটা জায়গা চিরে গিয়েছিল। রক্ত বন্ধ হল, বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ল। সুরধুনী ঠাকরুণের জড়িবুটি ডাকলে সাড়া দিত। ঘাটের মড়া উঠে বসত সুরধুনী ঠাকরুণের হাতের গুণে। বাঘেখেকো বেঁচে গেল।

সেই বাঘেখেকো এখন বাইশ বছরের তাগড়া জোয়ান। কপালে-গালে অনেকগুলো কালো কালো দাগ। মাথা বোঝাই কোঁকড়ানো চুল, গলায় একগাছা সাদা ধপধপে পৈতে। পার্বতীশঙ্কর পৈতে দিয়েছেন ওর। কেনই বা দেবেন না। ও কার ঘরে জন্মেছিল কেউ জানে না। পার্বতীশঙ্কর ওর সত্যিকারের জন্মদাতা না হলেও জীবনদাতা নিশ্চয়ই। সুতরাং পার্বতীশঙ্করের যা জাত বাঘেখেকোর সেই জাত।

গোত্রও এক। দস্তুরমত ঘটা করে বিস্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভোজন করিয়ে নিখুঁত শাস্ত্রসম্মতভাবে পৈতে দিয়েছেন ওর পার্বতী-শঙ্কর। পৈতের সময় নাম দরকার হয়। নতুন নাম হল বাঘেখেকোর পশুপতিনাথ শর্মা। ন' বছর বয়েসে পশুপতি স্কুলে ভরতি হল। ষোল বছর বয়েসে স্কুল ছেড়ে দিলে। লেখাপড়া সেইখানেই খতম। হঠাৎ সবাই জানতে পারলে পশুপতি মস্ত বড় বাউলের শিষ্য হয়েছে। সাচ্চা দরবারে ভোলে বোমকে গান শোনাতে এলেন বাঁকাবিহারী বাউল। তাঁর গান শুনে পশুপতি হঠাৎ গাইতে শুরু করলে। হুবহু এক, যেন তরুণ বাঁকাবিহারীই গাইছেন। বাউল প্রেমানন্দে পাগল হয়ে উঠলেন। মাসখানেক সাচ্চা দরবারে থেকে ঝুলি উজাড় করে সব বিদ্যে দান করলেন শিষ্য পশুপতিকে। আবার একটি নতুন নাম হল বাঘেখেকোর—রেণুদাস বাউল। বছরখানেক রেণুদাস গুরু বাঁকাবিহারীর সঙ্গে ঘুরে পার্বতীশঙ্করের কাছে ফিরে এল। নিয়ে এল একটা গুব্‌গুবা গুব্‌ যন্ত্র আর উৎকট অভিমান। একটু কিছু ঘটলেই হল, অমনি উধাও। পড়ে রইল গিয়ে বেখাপ্পা জায়গায়। জল জঙ্গল সাপ কোনও কিছুর পরোয়া নেই। যতক্ষণ না স্বয়ং পার্বতীশঙ্কর যাবেন সেখানে ততক্ষণ ও কিছুতেই উঠবে না। পার্বতীশঙ্কর যাবেন, ওর মাথার ওপর হাত রেখে চুপিচুপি কয়েকটা কথা বলবেন, তবে ও উঠে পড়বে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, একমাত্র পার্বতীশঙ্করই জানতে পারেন কোথায়

পড়ে আছে বাঘেখেকো। হাজার চেষ্টা করেও অন্য কেউ ওকে খুঁজে বার করতে পারে না।

তারপর কয়েকটা দিন মহাসমারোহে কেটে যায়। সন্ধ্যার পর জপের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন পার্বতীশঙ্কর। বসে গানের আসর ভোলে বোমের নাটমন্দিরে। পায়ে ঝুমুর বেঁধে বগলে গুব্‌ গুবা গুব্‌ রেণুদাস গান গায়। থামাথামি নেই, একটার পর একটা গেয়েই চলে। দশটা সাড়ে দশটায় বাবার শয়ন হয়। পার্বতীশঙ্কর চলে যান তাঁর জপের ঘরে। বাঘেখেকো নাটমন্দিরের এক কোণে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

বাঘেখেকো নয়, বাউল রেণুদাস বাবাজী। বর্ধমান বাঁকড়ো নদে চব্বিশ পরগণা দূর দেশ থেকে লোকে নিতে আসে বাবাজীকে। বাবাজীর এক কথা, পাদমেকং ন গচ্ছামি। শুনতে ইচ্ছে হয়, সাচ্চা দরবারে দু'দশ দিন থাক, যত খুশী গান শোন। কিছুতেই নড়বেন না বাবাজী সাচ্চা দরবার থেকে। বেশী পেড়াপীড়ি করলে হিতে বিপরীত ঘটবে। গান বন্ধ হবে, সরে পড়বেন বাবাজী। এমন জায়গায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবেন যে কেউ খুঁজে পাবে না। শেষ পর্যন্ত পার্বতীশঙ্করকে জপ ছেড়ে উঠে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।

মেলার সময় সাচ্চা দরবারে একটা কেন, একশটা মানুষ দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। লোকে লোকে লোকারণ্য হয় যখন সাচ্চা দরবার তখন সেই অরণ্যে কে কাকে খুঁজে বার করবে। শ্রাবণী পূর্ণিমার পর সাচ্চা দরবার নিঝুম। সকালের দুখানা গাড়িতে যে কজন যাত্রী আসে তারা বাবার মাথায় জল চড়িয়ে দুপুরের গাড়িতেই ফিরে যায়। বিকেলের দিকে নতুন মুখ আর চোখেই পড়ে না। সন্ধ্যা হতে না হতেই দোকানদাররা ঝাঁপ ফেলতে শুরু করে। রেল লাইনের ওপারে শিয়ালরা হাঁকাহাঁকি জুড়ে দেয়। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রসিক লোকেরা নারকেল বাগানের দিকে পা বাড়ায়। বালাখানার পানের দোকান সন্ধ্যার পর জাঁকিয়ে ওঠে। মেলার পর রোহিলা স্বস্থানে প্রস্থান করেছে। চার আনা গেলাস মাল খাবারও লোক নেই। মালসী বাড়িউলীর ইজ্জত আছে, মেয়েকে সে পানের দোকানে বসাতে পারবে না। বালাখানা নির্ঝঞ্ঝাটে পান বেচছে। পরোয়া নেই। মাস-দুয়েক পরেই আবার লাগছে এক মেলা। রোহিলাকে খোশামুদি করার দরকার কি। শেওড়াফুলি থেকে নিয়ে আসবে ঘুঙুরকে। ঘুঙুর আর চুমরি দু'বোন, দুজনকেই নিয়ে আসবে বালাখানা। দেখিয়ে দেবে সাচ্চা দরবারের বাজারকে টাকা কিভাবে কামাতে হয়। চালাবে স্রেফ ঘোল, যার পঞ্জাবী নাম লস্যি। সোজা আট আনা গেলাস। একদম বেনারসী শরবৎ। খেলে তর

হয়ে যাবে খদ্দের। চাই কাঁচা ভাং, সের পাঁচেক। বালাখানার দেশ মুঙ্গের জেলায়। জংলী ভাং সেখানে বেধড়ক জন্মায়। দেশে চলে যাবে বালাখানা দিন-দশেকের জন্যে, ভাং নিয়ে আসবে। তারপর ঘুঙুর আর চুমরি, ওরা দু'বোনেই বাজিমাত করে ছাড়বে।

সবাই শান্তিতে আছে কয়েকটা দিন। শুধু উমাশঙ্করের চোখে ঘুম নেই। মাইল-পাঁচেক পশ্চিমে এক গাঁয়ে জয়াকে রেখে এসেছেন রামশম্ভু মাস্টার মশায়ের বাড়িতে। রামশম্ভু মাস্টার বুড়ো হয়েছেন, চোখে দেখতে পান না। একমাত্র সম্বল বিধবা কন্যা মুক্তি। বিশ বছর বিধবা হয়েছে মুক্তি, এখন তার বয়েস ছত্রিশ। আগাগোড়া বাপের সংসারেই আছে। ভায়েরা বড় বড় চাকরি নিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। মুক্তিই বাপকে পাহারা দেয়। উমাশঙ্করের সঙ্গে মুক্তির অহি-নকুল সম্বন্ধ। দেখা হওয়া মাত্র ঝগড়া, একেবারে মুখখিস্তি শুরু হয়ে যায়। একদা উমাশঙ্কর রামশম্ভু মাস্টারের সব চেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিলেন। মুক্তির মা তখন বেঁচে ছিলেন। নিজের ছেলের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন তিনি উমাশঙ্করকে। যথাসময়ে যথাস্থানে মেয়ের বিয়ে দিলেন মাস্টার মশাই। উমাশঙ্কর তখন শ্রীরামপুরের কলেজে ভরতি হয়েছেন। বছরখানেকের মধ্যে মুক্তি বিধবা হয়ে বাপের কাছে ফিরে এল। দেখা করতে গেলেন উমাশঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেল ঝগড়া। কি নিয়ে লেগেছিল ঝগড়াটা

কেউ বলতে পারে না। সেই ঝগড়া বিশ বছর ধরে সমানে চলে আসছে। গালাগালি না দিয়ে কথা বলে না কেউ। যেমন সেদিন হল। জয়াকে নিয়ে পৌঁছলেন যখন উমাশঙ্কর মাস্টার মশায়ের বাড়িতে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। বাবার কাছে বসে ভাগবত পড়ছিল মুক্তি। উমাশঙ্কর সাড়া না দিয়েই ঘরের ভেতর উপস্থিত হলেন। প্রথম সম্ভাষণ এইভাবে শুরু হল—“এই যে গেছোপেত্নী, ও আবার কি হচ্ছে? ধম্মে মতি হল কবে থেকে?”

ভাগবত বন্ধ করে কপালে ছুঁইয়ে মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—“এস পোড়ারমুখো যম। তোমার কথাই হচ্ছিল আজ বাবার সঙ্গে। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মেজ ঠাকুর মশাইটিকে আর দেখি না কেন রে? আমি বললাম— পোড়ারমুখো যম কোথায় গেছেন কার ঘরে আগুন দিতে। তখনই জানতাম, যম ঠিক এসে পড়বেন রাত না পোয়াতেই। ঠিক তাই হল, স্মরণ করতে না করতে যম উপস্থিত। নাও এখন, এই অসময়ে কি দিয়ে যমের খিদে মেটাবে বল!”

উমাশঙ্কর যেন শুনতেই পেলেন না মুক্তির কথা। এগিয়ে গিয়ে মাস্টার মশায়ের পায়ের ধুলো নিলেন। মাস্টার মশাই বললেন—“কে? উমা এলি? বড্ড ভাবছিলাম তোর জন্যে রে।”

ততক্ষণে জয়াও ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। মুক্তির নজর পড়ল জয়ার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল সে। জয়ার

দু'হাত ধরে বলল—"এস ভাই এস। মুখপোড়া যমের পাল্লায় পড়েছ যখন তখন অশেষ খোয়ার আছে তোমার কপালে। এত লোককে নিচ্ছে যমে, ওঁকে কিন্তু দেখতে পায় না। শুধু শুধু কি আর আমি যমের অরুচি পাতিয়েছি!"

হ্যাঁ, সে সেই অনেক দিনের কথা। তরুণ উমাশঙ্কর সেদিন যেচে একটা মধুর সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছিলেন মুক্তির সঙ্গে। মুক্তি বলেছিল—যমের অরুচি। কেন যে হঠাৎ ঐ কথাটা বেরিয়ে পড়েছিল মুক্তির মুখ থেকে তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু সেই যমের অরুচি পাতানো সম্বন্ধ বিশ বছর ঠিক টিকে আছে। বছর আষ্টেক আগে দারুণ অসুখ করে মুক্তির। অসহ্য যন্ত্রণা হত মাথায়, কিচ্ছু খেতে পারত না, শুকিয়ে খেংরাকাঠি হয়ে গিয়েছিল। উমাশঙ্কর তখন জেল খাটছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে মুক্তিকে বললেন—"যমের অরুচি, এ তুমি করছ কি? তোমাকে যদি নিয়ে যায় যমে তাহলে আমাদের যমের অরুচি পাতানো যে মিথ্যে হবে।" তারপর লাগল লড়াই যমের সঙ্গে। যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিলেন মুক্তিকে উমাশঙ্কর। দুই ভাই পার্বতীশঙ্কর আর ভবানীশঙ্কর হুড়হুড় করে টাকা ঢাললেন। সমুদ্রের ধারে পুরীতে এক বছর, পাহাড়ে দু'বছর, রাজগীরে তিন বছর, এখানে ওখানে সেখানে বছর আষ্টেক হাওয়া বদল করতে করতে উমাশঙ্করের যমের অরুচি খাড়া হয়ে উঠল। রামশম্ভু মাস্টার মেয়ে নিয়ে গ্রামে এসে বসলেন

আবার। উমাশঙ্কর তখন ফেরার। স্বদেশী সরকার হন্যে হয়ে খুঁজছে তখন উমাশঙ্করকে। সাংঘাতিক অভিযোগ, গণতন্ত্রকে ফাঁসাবার জন্যে তিনি নাকি বিরাট ষড়যন্ত্র করেছিলেন। সে যাত্রা গণতন্ত্র রক্ষা পেল। গণেশ উল্টে গেল। দেশটাকে হাতে পেয়ে চুটিয়ে যাঁরা গণতন্ত্র মধু পান করছিলেন তাঁদের সরে দাঁড়াতে হল। নতুন যাঁরা এলেন তাঁরা দরাজ হৃদয়ে উমাশঙ্করের মত গণতন্ত্রের শত্রুদের ওপর থেকে হুলিয়া তুলে নিলেন। উমাশঙ্কর সশরীরে প্রকট হলেন। বেলা তখন গড়িয়ে গেছে অনেকটা। যমের অরুচি দু'জনের পানে তাকিয়ে—যমের চোখেও তখন সাঁতার-পানি।

যাক গে, সে-সব পুরনো ইতিহাস।

জয়া আশ্রয়ের মত আশ্রয় পেল। উমাশঙ্কর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু বিধি হল বাম। বাঘেখেকো ওরফে বাবাজী রেণুদাস বাউল রামশম্ভু মাস্টারের গ্রামে একটা মনের মত জায়গা খুঁজে পেলে, যেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকা যায়। মরা নদী একটা তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে সেই গ্রামের পাশ দিয়ে। সেই নদীর ধারে গ্রামের মড়া পোড়াবার স্থান। বিরাট একটা বেওয়ারিশ বাঁশঝাড় আছে সেখানে, যদৃচ্ছা বাঁশ কেটে নিয়ে লোকে মড়া পোড়ায়। বাঁশ-ঝাড়টির জন্যেই জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল বাঘেখেকোর। বাঁশঝাড়ের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটা ঢিবিমত আছে,

সেখানে গাছপালা গজায় না। রেণুদাস সেই স্থানটি আবিষ্কার করে ফেললে। দা-কাটারি যোগাড় করে কঞ্চি কেটে নিয়ে ছোট একখানি ঝুপড়ি বানালে। তারপর আর ভাবনা কি? মেজাজ খচে গেল একদিন। সোজা এসে সেই ঝুপড়িতে আশ্রয় নিলে। পার্বতীশঙ্কর তখন এক বড়মানুষ যজমানের সঙ্গে চলে গেছেন কেদারবদরী। কে তাকে খুঁজে বার করবে।

খুঁজতে হল না, জয়া রেণুদাসকে না খুঁজেই পাকড়াও করলে একদিন।

ভোরবেলা একটা ঘটি হাতে করে বেরিয়ে পড়ে জয়া। ঘণ্টাখানেক স্বাধীনতা ভোগ করত। চলে যেত সেই তির-তিরে নদীর ধারে। নদীর ভিজে বালি দিয়ে দাঁত মেজে ঘটিতে করে জল তুলে স্নান করে ফিরে আসত। মুক্তিই ঐ মতলবটা দিয়েছিল। অন্ততঃ এক ঘণ্টা খোলা আকাশের তলায় ঘুরে বেড়াক। নয়ত দম আটকে মরে যাবে যে।

সেদিন জয়া যখন দাঁড়াল গিয়ে নদীর ধারে, তখন সেই বাঁশঝাড় কথা বলছে। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি সেই অত কুৎসিত বাঁশঝাড়টাই গাইছে—'আমি হব না সতী, না হব অসতী, তবু আমি পতি ছাড়ব না। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে—চুল ভিজাব না।'

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়া। বাঁশঝাড় গেয়েই চলল—'জলে নামবো, জল ছড়াব, জল তো ছোঁব না। আমার যেমন

বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না।'

তারপর, মানে তার কতক্ষণ পরে যে সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল তা জয়াও বলতে পারবে না, মোটের ওপর হঠাৎ এক সময়ে জয়া দেখতে পেলে একটা মানুষকে। মানুষটা বেরিয়ে এল বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে। নেমে গেল নদীতে। গান কিন্তু সমানেই চলছে—'গোসাঁই রসরাজ বলে শুন গো নাগরী ও রূপের যাই বলিহারি—'

আচম্বিতে এক কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড। হাতের ঘটিটা সজোরে ছুঁড়ে মারলে জয়া। ঘটিটা গিয়ে পড়ল সেই মানুষটার পায়ের সামনে। গিথে গেল বালিতে। গান বন্ধ হল ঝপ করে। মানুষটা বোকার মত ঘটিটার পানে তাকিয়ে রইল।

সাচ্চা দরবার।

সাক্ষাৎ ভোলে বোম্ সাচ্চা দরবার খুলেছেন। কে বলে ভোলানাথ পাষাণ দেবতা!

হ্যাঁ হ্যাঁ মানছি, তৃতীয় নয়নের আগুনে ভস্মীভূত করেছিলেন যিনি কামদেবকে তাঁর তুল্য পাষাণ আর কে? কিন্তু কামের চেয়ে ঢের বড় ঢের শক্তিমান আর এক দেবতা যে জন্মগ্রহণ করলেন সেই ভস্ম থেকে। আকাশ বাতাস আলো অন্ধকার সর্বত্র সেই দেবতার লুকোচুরি খেলা চলছেই। কার

সাধ্য তাকে ভস্ম করে।

স্বয়ং ভোলে বোম্ সিদ্ধিলাভ করেছেন সেই দেবতার সাধনা করে। তাই তো বুঁদ হয়ে থাকতে পারেন তিনি। কামভস্ম থেকে যিনি জন্মগ্রহণ করেন তাঁর প্রসাদে অমরতা লাভ করা যায়। মজা হচ্ছে সহজে তাঁকে কেউ চিনতে পারে না।

চিনতে পারলেও কিছুতেই ধরা দেন না তিনি।

কেন ধরা দেবেন, কাম যেখানে নেই সেখানে চাওয়া নেই পাওয়া নেই।

আছে মিলিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া একদম লীন হয়ে যাওয়া।

আসল সাচ্চা দরবার হল সেইখানে যেখানে পৌঁছলে লীন হয়ে যাওয়া যায়।

সেই মহাতীর্থের হদিস কে করে ?

অনেকগুলো মহাতীর্থ দর্শন করে ফিরে এলেন পার্বতী-শঙ্কর।

কতখানি পুণ্য জমা হল তাঁর ভাঁড়ারে তা তিনি নিজেই জানতে পারলেন না। তবে পাপক্ষয় হল বটে। তীর্থযাত্রা হচ্ছে এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত করা। অর্থসামর্থ্য যতটা না খরচা হয় তার ঢের বেশী খরচা হয় মনের শান্তি। শান্তি নয় স্থৈর্য।

মন বুদ্ধি প্রকৃতি অহঙ্কার, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ঐ শেষ চারটি তত্ত্বকে নাহক নাস্তানাবুদ করতে চাও যদি তাহলে তীর্থে যাও। (প্রাণ্ডা গুণ্ডা ষণ্ডা-রণ্ডাদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যখন ঘরে ফিরে আসবে তখন দেখবে তোমার জমাখরচের খাতায় পাপের ঘর ফাঁকা। বিলকুল পাপ খরচা হয়ে গেছে। ঐজন্যেই তো বলে তীর্থে গেলে অনন্ত পাপ নাশ হয়।)

পার্বতীশঙ্করের সম্বল ছিল কম, অনন্ত পাপ তো দূরের কথা, একপো আধপো পাপও বোধ হয় তাঁর সম্বল ছিল না। একদম ফতুর হয়েই ফিরে এলেন বলা চলে। ফিরে এসে জপে বসলেন। বসে দেখলেন যন্ত্র বিগড়ে গেছে, বেসুরো বাজছে যন্ত্রখানা, যে জপ করবে সে কই! খাঁচাখানা জপের ঘরে ঢুকে আসনে বসল বটে কিন্তু পাখী নেই। কেন এমনটা হল।

শেষে দুঃ-তোর-ছাই বলে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে এলেন জপের ঘর থেকে। বাঘেখেকোকে মনে পড়ে গেল। গেল কোথায় সে? গান শুনতে হবে—'মণিকোঠায় আঁটা ঘর রত্নবেদী তার উপর, তার উপরে বিরাজ করে চিনতে নারে কোনই জন, বান্দা আমার মন।' বান্দা মন বেয়াড়াপনা করছে। ধরে আন রেণুদাস বাবাজীকে। গান শোনাক বাবাজী। বান্দা মন ধাতস্থ হোক।

কোথায় রেণুদাস।

খোঁজ করে জানতে পারলেন রেণুদাস প্রায় মাসখানেক

উধাও হয়েছে। সাচ্চা দরবারের বহু মানুষ বহু জায়গায় খুঁজেছে, একদম বেপাত্তা হয়ে গেছে বাবাজী, কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই।

একটা আস্ত রাত ঠায় হাঁটতে লাগলেন পার্বতীশঙ্কর, শত শত বার ভোলে বোমের মন্দির নাটমন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর আবার জপের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। যাক, শেষ পাপটুকুও দূর হল। বন্ধন মাত্রই পাপ, বাঘেখেকো ছিল ওঁর পায়ের বেড়ি, পায়ের বেড়ি খসে গেল নিজে থেকে। আপদ গেল।

আপদ যাওয়ার বিষাক্ত আনন্দটা এমনই মোচড় দিতে লাগল বুকের ভেতর যে দিনতিনেক একদম জপের ঘর থেকে বেরোলেন না পার্বতীশঙ্কর। একমাত্র সাচ্চা দরবারের অধিপতিই টের পেলেন বোধ হয় তাঁর দশা। দেবতা পাষাণ হলেও ভোলে বোম্। বোম্ ভোলের নেশা টুটে গেল।

মাইল-পাঁচেক পশ্চিমে তিরতিরে নদীর ধারে বাঁশঝাড়ের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে রেণুদাস তখন গাইছে—

'চুল হল রে তোর শোনলুটি।
কবে আর বলবি রে ভাই তারণ নাম দুটি।
চুল হল তোর শোণলুটি॥'

সবে ভোর হচ্ছে। বাঁশঝাড়ের ভেতর তখনও পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাখীদের কিচিরমিচিরের জন্যে স্পষ্ট শোনাও যাচ্ছে না গানটা। বাঁশের আড়ালে লুকিয়ে

দাঁড়িয়ে জয়া দেখবার চেষ্টা করছে লোকটা কি করে। কিছুই করছে না লোকটা, কঞ্চি আর তালপাতা দিয়ে বানানো ঝুপড়িটার তলায় কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে। কিন্তু গেয়ে চলেছে ঠিক।

'এদিকে হল তলপ, গোঁফে কলপ
পান খেয়ে লাল ঠোঁট দুটি।
গিয়েছে সব কটি দাঁত, শুকিয়েছে আঁত
ধরেছ ভাত এক মুটি।
চুল হল তোর শোণলুটি॥'

কি হয়েছে ওর!

কেন এভাবে লুকিয়ে রয়েছে!

সাপের ভয় পর্যন্ত নেই। লুকিয়ে থাকবার জন্যে এমন সাংঘাতিক জায়গা বার করেছে যে যমেও খুঁজে পাবে না। জয়াও লুকিয়ে আছে, দিনের বেলা রামশম্ভু মাস্টারের বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না, ভোররাত্রে মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে আকাশের তলায় ঘুরতে পায়। জয়াও যদি এই লোকটার মত একটা জায়গা খুঁজে পেত! কিন্তু মানুষ কি এই রকম জায়গায় থাকতে পারে?

এই লোকটা কিন্তু মানুষ, সত্যিকারের মানুষ। মানুষের মত গাইছে—

'আমার জাত গেল পেট ভরল না মন ওলো—নাগরী, আমার দুই নয়নে বয় বারি।'

জয়ার কানে ঢুকছে না ওর গান। ও ভাবছে, মানুষ নিশ্চয়ই। ভূত-প্রেত নিয়ে কখনও মাথা ঘামাবার সুযোগ ঘটেনি ওর জীবনে। তা'ছাড়া ভূতে নিশ্চয়ই গান গায় না। নদীতে স্নান করতে নামে না ভূত, আঁজলা আঁজলা জল তুলে গায়েমাথায় থাবড়ে কাকস্নান করে না। চার-পাঁচ দিন ওকে স্নান করতে দেখেছে জয়া। তারপর খুঁজতে খুঁজতে বাঁশঝাড়ের ভেতর ওর আস্তানাটা বার করে ফেলেছে। কিন্তু খায় কি লোকটা? না খেয়ে বেঁচে আছে নাকি?

প্রথম দিন হাতের ঘটিটা ছুঁড়েছিল জয়া। কেন ও কম্ম করতে গিয়েছিল তা নিজেই বলতে পারবে না। ঘটিটা ছুঁড়েই পালিয়ে গিয়েছিল। কেন পালিয়ে গিয়েছিল তাও বলতে পারবে না। তারপর থেকে ও রোজ আসছে, রাত্ত থাকতে বেরোচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বাঁশঝাড়ের ভেতর ঢুকে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক লোকটাকে ধরে ফেলেছে।

যাবে নাকি ওর কাছে?

গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে ও কে?

কেন ও এভাবে প্রাণটা দিতে এসেছে?

কি যে হল জয়ার, বুদ্ধিসুদ্ধি যেন লোপ পেল হঠাৎ, ছ' হাতে কঞ্চিগুলো সরিয়ে বেরিয়ে এল বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে। পা টিপে টিপে দাঁড়াল গিয়ে ঝুপড়িটার কাছে। এইবার সে কান পেতে শুনতে লাগল গান। আর একটা গান ধরেছে তখন লোকটা—

'কোকিল দেখতে ভাল চিকন কালো,
তারে লাগে ভাল তার গুণে,
কিছু হয় না অনুরাগ বিনে।'

মস্ত একটা পাখী লুকিয়ে ছিল কোথায়। ঝপাঝপ ডানা ঝাপটে কানফাটানো চিৎকার করে আকাশে উঠল। একই সঙ্গে আর একটা দুর্ঘটনাও ঘটে বসল। দুটো বেঁজি ছুটে এসে ধাক্কা খেলে জয়ার পায়ে। একটা বিদ্‌কুটে আওয়াজ বেরিয়ে পড়ল জয়ার মুখ দিয়ে, খানিকটা তফাতে ছিটকে পড়ল সে। বেঁজি দুটোও উধাও।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বাবাজী রেণুদাস, অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল একটু সময় জয়ার পানে। জয়া তখনও সামলাতে পারেনি নিজেকে। অতি অসহায় চাউনি ফুটে উঠেছে তার চোখ দুটিতে। রেণুদাসের পানে তাকিয়ে একটু একটু করে পেছোচ্ছে।

'টপ করে গান ধরলে বাবাজী—
দেখ না মন নেহার করে।
আছে এক বস্তু চাপা, রসে ঢাকা রসিকজনার অন্তরে।
দেখ না মন নেহার করে।'

ভবানীশঙ্কর ঠাকুরদাদাকে বোঝাচ্ছেন, এইবার বাঘে-খেকোর বিয়ে দেওয়া দরকার। সংসারধর্ম করুক তাহলেই

ঐ পালিয়ে বেড়ানো ব্যাধিটি দূর হবে। তিন ভায়ের মধ্যে একজনই প্রকৃত সংসারী। ছোট ভাই ভবানীশঙ্কর দাদাদের মত বাউণ্ডুলে নন। বিয়ে-থা করে সংসার করছেন। ধান-চাল যাত্রী যজমান সামলান, দরকার পড়লে মামলা-মকদ্দমাও করেন। সোজা মানুষ, সহজভাবে বোঝেন দুনিয়ার হালচাল। বাঘেখেকোকে পর ভাবেন না। তাঁদেরই আত্মীয় তাঁদেরই সম্পত্তি। বিয়ে করবে না কেন ?

পার্বতীশঙ্কর হাঁ-না কিছুই বলছেন না, গুম মেরে আছেন। আর ভাবছেন কবে ফিরবে বাঘেখেকো! ফিরবে না সে ? তার মানে শিকল কাটল ? চরম সত্য কি তা জানেন পার্বতী-শঙ্কর। সাচ্চা দরবারের অধীশ্বরই চরম সত্য। বার বার সেই চরম সত্যকেই জিজ্ঞাসা করছেন, কেড়ে নিলে ছেলেটাকে ? তার মানে হার মানালে আমায় ?

অনেক দিন আগে এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন সাচ্চা দরবারে। সন্ন্যাসীর চেলা বনে গিয়েছিলেন পার্বতীশঙ্কর। সেই সন্ন্যাসী যুবক চেলাটিকে বলে দিয়েছিলেন বোম্ ভোলের আসল পরিচয়। শুধু বলেই দেননি, দেখিয়ে দিয়েছিলেন সত্যিকারের ভোলে বোমকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে যাঁর শক্তিতে, অবিরাম সৃষ্টি হচ্ছে, লয় হচ্ছে, লয় হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, হরদম রূপ পালটাচ্ছে যে কারণটির দরুন, সেই কারণটিই স্বয়ং সাচ্চা দরবারের অধীশ্বর। তারপর যথাসময়ে ইষ্ট-দীক্ষা গ্রহণ করেন পার্বতীশঙ্কর এক সিদ্ধ সাধকের কাছে।

গুরুর কৃপায় সাধনা করেন, মন্ত্রচৈতন্য লাভ হয়। কাকরূপিনী করালী রক্ষা করছেন পার্বতীশঙ্করকে তাই সাচ্চা দরবার আর ভোলে বোম্ তাঁর কিছুই করতে পারছে না। কিন্তু এ কি হল!

কেন তাঁর এত বড় অহঙ্কার হল যে বাঘেখেকোকেও সাচ্চা দরবারের দরবারী কায়দা থেকে আলাদা করে ছিনিয়ে নেবেন!

কবে কোন্ যুগে মানুষ তপস্যা করে চরম সত্যের নাগাল পেয়েছিল, সেই সত্যের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে চেয়েছিলেন পার্বতীশঙ্কর। থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল।

হাঁ, মানতেই হবে একমাত্র সত্য হল কাম, ঐ বিষ থেকে উৎপত্তি, ঐ বিষেই স্থিতি আর ঐ বিষেই লয়। সেই কাম আর কামশক্তির প্রতীক ঐ লিঙ্গ আর তার চতুর্দিকে ঐ যোনিপীঠ। একদা যাঁরা লিঙ্গপূজা আরম্ভ করেন তাঁরা চরম সত্যকে ফাঁকি দিতে চাননি। চরম সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে চরম মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা বোকা ছিলেন না।

বাঘেখেকোকে হারালেন পার্বতীশঙ্কর। হাড়ে হাড়ে টের পেলেন সাচ্চা দরবার কাকে বলে।

অবিরাম জপতে লাগলেন দুঃখহারিণী বিশ্বজননী মহামায়া ব্রহ্মময়ী কালী।

অহর্নিশ ইষ্টদেবীর চরণে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে লাগলেন—

'ডুবিয়ে দে মা তলিয়ে দে, তোরই অন্ধকারের অন্তরালে
লুকিয়ে ফেল মা আমায়, এ মুখ যেন কেউ দেখতে না পায়।'

সাচ্চা দরবার।

অসত্যের ঠাঁই নেই সাচ্চা দরবারে। ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার আশায় মানুষে সাচ্চা দরবারে গিয়ে ধরনা দেয়। সব চেয়ে বড় ব্যাধি অসত্য। সেই ব্যাধি থেকে মুক্তি পেলেন পার্বতীশঙ্কর। কামের চেয়ে বড় যে শক্তি সেই শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

প্রায় মাসখানেক নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন উমাশঙ্কর। ওটা ওঁর স্বাভাবিক চালচলন। কেউ ও নিয়ে মাথা ঘামায় না। হঠাৎ বলতে কোনও কথা উমাশঙ্করের অভিধানে নেই। হঠাৎ চলে গেলেন, হঠাৎ ফিরে এলেন। ফিরে এসে এমনভাবে মিশে গেলেন সকলের সঙ্গে যে ওঁর যাওয়াটা সবাই ভুলে গেল। এ এক মজার ব্যাপার। সাচ্চা দরবারে মেজঠাকুর মশাইকে সবাই চেনে। যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করুন মেজকর্তা কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবেন, এই তো ছিলেন, কোন্ দিকে গেলেন যেন। যাবার সময় আসি বলে বিদায় নিয়ে যাওয়া উমাশঙ্করের কোষ্ঠীতে লেখেনি। তেমনি এসে যখন পড়বেন তখনও কেউ জানতে পারবে না কখন উনি এলেন। যেন আগাগোড়া সামনেই ছিলেন, কেউ দেখতে পাচ্ছিল না,

প্রকট হলেন বলে সবাই দেখতে পেল। যেমন মুক্তি সেদিন দেখতে পেল।

ভোরবেলা জয়া গেছে নদীতে, যাবার সময় রোয়াকের ওপর বৈঠকখানার দরজাটা টেনে দিয়ে গেছে। খানিক পরে বিছানা থেকে উঠে মুক্তি এক বালতি জল নিয়ে বেরুল রোয়াকটা ধুয়ে আসবার জন্যে। রোয়াক ধুয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে বেশ একটু হকচকিয়েগেল। একটা মানুষ চাদর মুড়িদিয়ে বেঞ্চির ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একটু সময় দেরি হল লোকটাকে চিনতে। হাঁ করেছিল কিছু বলার জন্যে, সামলে নিলে। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা পেরুতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল—"তোমাদের বাড়ি চা হয় কখনো যমের অরুচি? খানিকটা চা পেলে হত। ভারী ঘুম পাচ্ছে, চা না খেলে উঠতে পারছি না।"

স্তব্ধ হয়ে রইল একটু সময় মুক্তি; তারপর ফিরে গিয়ে বেঞ্চির পাশে দাঁড়াল। কিছু একটা বলার জন্যে মাথা ঘামাতে লাগল যেন। মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে উমাশঙ্কর বললেন—"জয়াকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। বেশী দিন এক জায়গায় রাখা যায় না। তোমাদের দিকটাও ভাবতে হয়।"

"মানে? আমাদের দিকটা নিয়ে ভাবতে হবে কেন?" মুক্তির স্বরে ঝাজ ফুটে উঠল।

মাস্টার মশাইকে এই বয়েসে হাঙ্গামা পোয়াতে হবে, এটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না।" উমাশঙ্কর বুঝিয়ে বলতে

লাগলেন—"তোমার জন্যেও ভাববার আছে। হারামজাদাদের পাল্লায় পড়নি তো কখনও। তারা মানুষ নয়, শয়তানও তাদের ডরায়। গায়ে হাত দেবে না, অত্যাচার করবে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্রেফ এটা ওটা সেটা প্রশ্ন করে চলবে। ঘাগী যারা তারাও মাথা ঠিক রাখতে পারে না, যা-তা বলে ফেলে। আর কেনই বা তোমাকে অনর্থক এই সব ঝামেলায় টেনে নামাব? বেশ তো আছ, বাবার সেবা করছ, জপতপ উপোস-তাবাস নিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছে। এজন্মে সুখী হলে না, পরজন্মে—"

কথাটা শেষ করতে পারলেন না, দুমদুম করে পা ফেলে মুক্তি ঘর'ছেড়ে চলে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার শোনা যেতে লাগল, "ও ষষ্ঠীর মা—ষষ্ঠীর মা, বলি মরে ঘুমোচ্ছ নাকি বাছা। ওঠ দিকিনি, বড় গাইটা দুইয়ে দাও। কাপড় ছেড়ে চায়ের জল বসাচ্ছি আমি। রোদ উঠে গেল, এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। যত জ্বালা হয়েছে আমার—"

উমাশঙ্কর উঠে পড়লেন। মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া চাই। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এখন ফিরছে না কেন জয়া? পাঁচ মাইল হাঁটতে হবে, কম-সে-কম দু'ঘণ্টার ধাক্কা। বলে তো দিলেন জয়াকে ঘণ্টা-খানেকের ভেতর রওনা হতে হবে। নদী দশ মিনিটের পথ। স্নান করে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? নদীতে না গেলেই তো হত। কৌশিক এসেছে, বসে আছে কৌশিক ওর

জন্যে, এ কথা শোনার পরেও গেল নদীতে। ছেলেমানুষ তো, দু'দিন যেখানে থাকবে মায়া পড়ে যাবে। মায়া পড়েছে নদীটার ওপর। আহা, যে ছব্বার নদী, গর্ত খুঁড়ে ঘটিতে জল তুলে মাথায় ঢালতে হয়। শহরের মেয়ে কিনা, বনজঙ্গল নদীনালা দেখলেই—

ভাবনায় ছেদ পড়ল। চেঁচাতে চেচাঁতে ঘরে ঢুকল মুক্তি —"কি—এখান থেকে একমুঠো গিলেযাবার ফুরসৎ হবে কি? না এখুনই সরে পড়তে চাও? জলদি বল, ডাল-ভাত গিলে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে কিনা?"

"আমার তাড়া নেই।" উমাশঙ্কর মস্ত একটা হাই তুলে বললেন—"যার তাড়া তারই দেখা নেই। নদীতে যায় কেন রোজ জয়া? বাড়িতে তো টিউবওয়েল্ রয়েছে।"

"ঘণ্টাখানেকের জন্য ভোরবেলা খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়ায়। তারপর এসে ঢোকে এই খাঁচায়, সারাটা দিন মুখ লুকিয়ে থাকে। এমন কি অন্যায় করেছে ও যার জন্যে এই শাস্তিভোগ করছে?" মুক্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষাক্ত গলায় বললে—"মেয়ে হয়ে জন্মেছে যে তাই ফল ভোগ করছে। নয়ত তোমার মত উড়ে বেড়াতে পারত।"

"আমার মত মানে একটা ঘুড়ির মত।" উমাশঙ্কর নিতান্ত ভালমানুষী গলায় ফোড়ন কাটলেন।

"তার মানে?" ফোঁস করে উঠল মুক্তি।

"মানে যার হাতে লাটাই তার মর্জিমাফিক। সুতো

ছাড়া বন্ধ করে হেঁচকা টান দিলেই গোত্তা খেয়ে পড়তে হয়।”

“কোথায় পড়তে হয়? কোন্ চুলোয় পড়তে হয়?” ক্রমেই মুক্তির গলা চড়তে শুরু করলে।

উমাশঙ্কর যেন রাগতেই জানেন না। শুনতেই পেলেন না যেন মুক্তি যা বললে। তাড়া দিলেন—“চা দেবে কিনা বল। আমার সময় নেই এখন ঝগড়া করার। জয়াটাকে খুঁজে আনতে হবে। পইপই করে বলে দিলাম তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্যে—”

“তাহলে জয়া যখন যায় তখন তুমি এসে পড়েছ?”

“তার অনেক আগে এসেছি। রাত থাকতেই এসেছি। মতলব ছিল রাত থাকতে থাকতেই ওকে নিয়ে চলে যাব। হল না, নদী থেকে ঘুরে না এসে ও কিছুতেই যাবে না। কি জানি রে বাবা, নদীতে এতক্ষণ কি করছে!”

“আমায় ডাকলে কেন? আমাকে না জানিয়েই জয়াকে নিয়ে সটকাতে নাকি?” খুবই নরম শোনাল মুক্তির গলা।

উমাশঙ্কর এতক্ষণ পরে চড়াগলায় জবাব দিলেন—“যদি মনে কর তাই তা'হলে নিশ্চয়ই তাই করতাম। যার যেমন মন, ঐ জন্যেই কথায় বলে মনের গুণে ধন।”

আর কিছু বললে না মুক্তি। মাথা হেঁট করে চা আনতে গেল।

‘আমি আর আসব না ঠাকুর।”

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্ততঃ দশবার বলা হল ঐ কথা। যাকে বলা হল সে বোধ হয় শুনতেই পেল না। গুনগুন করে গেয়েই চলেছে—

'সামাল মাঝি এই পারাবারে।
ভারি বান ডেকেছে সাগরে ॥
(এবার) তোমার দফা হল রফা
প'ড়ে গেলে ফাঁপরে।
সামাল মাঝি এই পারাবারে ॥
(এবার) নতুন তুফান দেখি ভারি,
(তোমার) খাটবে নাকো জারিজুরি
তাই ভেবে মরি,
কত বড় বড় পাকা নেয়ে
তাতে হাল ছেড়ে ঘুরে মরে।
সামাল মাঝি এই পারাবারে।
ভারি বান ডেকেছে সাগরে ॥'

হাল ছেড়ে দিয়েই জয়া উঠে পড়ল।

বদ্ধ পাগলটাকে বোঝানোও গেল না যে কাল সকালে সে আসবে না। চব্বিশ ঘণ্টা পরে আবার ভোর হবে, বাঁশ-ঝাড়টা জেগে উঠবে, পাগলটা চক্ষু বুজে উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে ঝুপড়ির ভেতর। চোখ চাইবে না, উঠে বসবে না, গান গাইবে না। আশা করে থাকবে, জয়া এসে ডেকে তুলবে তাকে। ডেকে তোলবার কায়দাও অদ্ভুত। গান গাইতে

হবে, হাজারবার ডাকলেও সাড়া দেবে না। যতক্ষণ না জয়া গেয়ে উঠবে—'খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে।'

দুনিয়ার সব চেয়ে বড় বাউলের খানকতক গান ভাগ্যে জয়া রপ্ত করেছিল!

ঐ গানটিই বদ্ধ পাগলটাকে তুলে বসায়। ঐ গানটি গাইতে গাইতেই জয়া পিছন ফিরলে। কয়েক পা সামনে বাঁশঝাড়ের ভেতর ঢুকে গাইতে লাগল—

'যে আসে তোরই পাশে, সবাই হাসে দেখে তোরে।
খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি।
তারা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস জনম ভরে।
খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে॥'

ঐটুকু গেয়ে আরও খানিক এগিয়ে গেল জয়া। আর একটু সামনে গিয়ে আবার দাঁড়াল। কি যেন শোনবার চেষ্টা করল। না বদ্ধ পাগলটা আর গাইছে না। চুপ করে তার গানই শুনছে। আবার সে চলতে শুরু করলে। সঙ্গে সঙ্গে গানও ধরলে—

'তোর নাই অবসর, নাইকো দোসর ভবের মাঝে।
তোরে চিনতে যে চাই সময় না পাই নানান কাজে॥
ওরে, তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে।
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা, দিবি সবায় পাগল করে।
খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ভরে॥'

উঠে দাঁড়িয়েছে তখন বাঘেখেকো। শুনছে কান পেতে। শুনতে শুনতে বেরিয়ে গেল ঝুপড়ি থেকে। একটু তফাতে একটা বাঁশঝাড়ের গোড়ায় উঁচু হয়ে বসে দু'হাতে মাটি সরাতে লাগল। বেরোল গলায় দড়ি বাঁধা সরা চাপা দেওয়া একটা মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে অন্য দিক দিয়ে ঢুকে পড়ল বাঁশঝাড়ের ভেতর। তখনও শোনা যাচ্ছে জয়ার গান—

'ওরে তুই কী এনেছিস, কী টেনেছিস ভাবের কালে।
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনও কালে ?
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে।
তুই কি সৃষ্টিছাড়া নাইকো সাড়া রয়েছিস কোন্ নেশার ঘোরে।
খ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল-ভরে॥'

নদীর জলে পা দিলে জয়া। গান থামিয়ে নিচু হয়ে কয়েক আঁজলা জল থাবড়ালে মুখে-মাথায়। জলটা পার হয়ে এসে ফিরে তাকালে। না, সে এল না।

বাঁশঝাড়টাকে লক্ষ্য করে শেষটুকু গাইলে—

'এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে—
বসে তুই আর এক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে
ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে—
মিছে তুই তারি লাগি আছিস জাগি না জানি কোন্ আশার জোরে।
খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ভরে॥'

গান শেষ করেই পেছন ফিরে লাগালে দৌড়। সময় নেই, ওধারে কৌশিক তার জন্যে বসে আছে।

বেরোতে বেরোতে রাত হয়ে গেল। তা হোক, চাঁদের আলোয় শরতের আকাশ আয়নার মত ঝকঝক করছে। গাঁ এড়িয়ে মাঠে মাঠে চলছে ওরা। ধান তখনও পাকেনি। কিন্তু মাথা উঁচু করে খাড়া হয়ে নেই, একধারে হেলে পড়েছে। আগে আগে উমাশঙ্কর হাঁটছেন। বার বার সাবধান করছেন জয়াকে। অনেক জায়গায় আল কাটা। বলে না দিলে পড়ে গিয়ে হাত ভাঙতে পারে।

গল্প নয় কিন্তু গল্পের চেয়ে অবিশ্বাস্য একটা কাহিনী শোনালে জয়া। নদীর ধারে একটা বাঁশঝাড়, বাঁশঝাড়ের মাঝখানে ঢিবিমত একটা জায়গায় কঞ্চি আর তালপাতা দিয়ে কুঁড়ে বানিয়ে একটা মানুষ লুকিয়ে আছে। অদ্ভুত গান গায় সে, কিন্তু বদ্ধ পাগল। শুধু গানই গায়, গান ছাড়া একটি কথা বলে না। আহা রে, কেউ আর যাবে না তার কাছে, ওখানে মরে পড়ে থাকবে, কেউ খুঁজে পাবে না। শেয়াল-শকুনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

“কিন্তু খায় কি সে? না খেয়ে বেঁচে আছে নাকি?” অনেকক্ষণ হা-হুতাশ শোনার পর উমাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাব যা দিলে উমা তা শুনে তাজ্জব বনে গেলেন। খায় সে শুধু শিকড়বাকড়; শিকড়বাকড় চিবিয়ে রসটুকু

খায়, ছিবড়ে ফেলে দেয়। ঐ খেয়েই বেঁচে আছে। শুধু সাপ ধরছে। এক হাঁড়ি সাপ ধরে মাটির তলায় রেখে দিয়েছে। একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে জয়া দেখেছে তার কাণ্ডকারখানা। মাটি সরিয়ে হাঁড়িটা তুলে সাপগুলোকে বার করলে। মড়ার মত পড়ে রইল তারা, যেন নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। খানিকক্ষণ পরে সাপগুলো নড়েচড়ে উঠল। তখন একটা মোটা শিকড় নিয়ে সাপেদের মুখের সামনে নাড়াতে লাগল সে। সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা সাপ হাতখানেক উঁচু হয়ে ফণা ধরে দাঁড়াল। তারপর মারলে ছোবল সেই শিকড়টার গায়ে। ছোবল মেরেই আবার যে-কে সেই, মড়ার মত পড়ে রইল। এইভাবে সব কটা সাপকে দিয়ে শিকড়টার গায়ে ছোবল লাগিয়ে শিকড়টা চিবিয়ে রসটুকু খেলে সে। শেষে সাপগুলোকে হাঁড়িতে পুরে মাটির তলায় রেখে দিলে। সবই আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে দেখেছে জয়া। যা স্বচক্ষে দেখেছে তা অবিশ্বাস করে কেমন করে!

অবিশ্বাস করলেন না উমাশঙ্কর, বিশ্বাসও করলেন না ষোল আনা। শুনলেন যেমন ভাবে তাবৎ আজগুবী কাণ্ড শুনে থাকেন। মনে মনে ঠিক করলেন, দু'চার দিনের মধ্যে ফিরে আসবেন। এসে সেই অদ্ভুত মানুষটির খোঁজখবর নেবেন।

এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল জয়াকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। এসে পড়েছেন প্রায়, আর মাইলখানেক যেতে

পারলেই স্টেশনের আলো দেখা যাবে। স্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসে থাকবে জয়া, উমাশঙ্কর কৌশিককে ডেকে আনবেন। ঘোমটা দিয়ে গাঁয়ের বউটির মত বসে থাকতে হবে জয়াকে। ভয়ের কিছু নেই, স্টেশন মাস্টার খুব ভাল লোক, উমাশঙ্করের সঙ্গে খাতির আছে। ভাগনী বলে পরিচয় দেবেন। ভাগনীকে নিয়ে ভাগনীজামাই কলকাতায় যাচ্ছে। ট্রেন আসবার সঙ্গে সঙ্গে জামাইবাবাজী উপস্থিত হবেন। গাড়ি এলেই কোনও দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে পড়বে জয়া। কৌশিক যেখানেই উঠুক না কেন ঠিক সময় এসে নামিয়ে নেবে। যদি কোনও ঝগড়া বাধে তাহলেও ভাবনা নেই। স্বয়ং উমাশঙ্করও ঐ গাড়িতে যাবেন। যে কোনও স্টেশনে হোক দেখা দেবেন জয়াকে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

জয়া বোধ হয় অন্য রকম কিছু আশা করেছিল। জোর করে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেলে মুখ টিপে হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণ ' পরে উমাশঙ্কর শেষ উপদেশটুকুও দিয়ে ফেললেন। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা রিভল্‌বার বার করে বললেন—"ধর এটা, কৌশিক দিয়েছে। ছটা গুলি পোরা আছে। কৌশিক বলেছে, এ জিনিস তুমি চালাতে জান। কোথায় নাকি একবার এই যন্ত্রটা চালিয়ে অহিদাকে কভার করেছিলে তুমি। একটিমাত্র কথা বলে দিয়েছে কৌশিক, গুলি নেই, অনর্থক একটা গুলিও যেন খরচা না হয়। মাদ্রাজে পৌঁছবার আগে গুলি মিলবে না।"

অস্ত্রটা নিলে জয়া। এতক্ষণ পরে তার হাতেপায়ে জোর এল যেন। উমাশঙ্কর আবার হাঁটা শুরু করেছেন। জানতেও পারলেন না অস্ত্রটা নিয়ে জয়া কি করলে। প্রথমে সে অস্ত্রটাকে ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলে। নিঃশব্দে বেশ লম্বা একটি চুমু খেলে যেন সেই সাংঘাতিক যন্ত্রটার গায়ে। তারপর সেটাকে চালান করলে জামার ভেতরে। গলার কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে আটকে রাখলে বক্ষবন্ধনীর সঙ্গে। ঠাণ্ডা ইস্পাতের স্পর্শে বুক গরম হয়ে উঠল।

দেখা যাচ্ছে তখন স্টেশনের আলো। উমাশঙ্কর সাবধান করলেন—"ঘোমটা দিয়ে থেকো। চাদরখানা বেশ করে জড়িয়ে নাও। স্টেশনে তোমায় বসিয়ে রেখে আমি ওদের খবর দিতে যাব। আধ ঘণ্টা পরেই গাড়ি, এই আধ ঘণ্টা তোমায় সাবধানে থাকতে হবে।"

"আমিও যাই না কেন সঙ্গে!" অস্পষ্ট ভাবে কথাটা জয়ার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

ধানজমি শেষ হল। একটা নালা টপকে উঠতে হবে পাকা রাস্তায়। উমাশঙ্কর লাফ দিয়ে নালা টপকালেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"হাতটা ধর শক্ত করে। এধারের মাটি নরম, পিছলে যাবে পা, নাও ধর।"

হাতখানা ধরলে জয়া, নালা টপকে এপারে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উমাশঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলেন—"কে? কে? কে ওখানে?"

টপ করে জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে অস্ত্রটাকে বার করে ফেলল জয়া। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে কি যেন একটা ধানজমির ভেতর নেমে গেল। মানুষ বলে মনে হল না, চার পায়ে হাঁটছে, শেয়াল-টেয়াল গোছের কিছু হবে।

উমাশঙ্কর বললেন—"হাঁ, আমার সঙ্গেই চল তুমি, স্টেশনে তোমাকে রেখে যাওয়া চলবে না। পেছনে ফেউ লেগেছে।"

"কিন্তু ওটা তো মানুষ নয়!" জয়া প্রতিবাদ করলে।

জবাব দিলেন না উমাশঙ্কর। স্পষ্ট দেখেছেন তিনি মানুষটাকে। কে কে বলবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা হামাগুড়ি দিতে শুরু করলে। হামাগুড়ি দিয়ে ধানজমির ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

সাচ্চা দরবার।

ভোলে বোমের শয়ন-আরতি শেষ হল। ঢাকের বাদ্য থামবার পর একদম নিষুতি হয়ে গেল সাচ্চা দরবার। মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন পার্বতীশঙ্কর। সেদিনের মত সব কাজ শেষ। এবার সারারাত মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে বসে থাকতে হবে। প্রহরে প্রহরে তামাক সেজে দিতে হবে বাবাকে। দু'তিনবার গাঁজা দিতে হবে। দরজায় ফুটো আছে, সেই ফুটোর ভেতর হাত গলিয়ে গাঁজার জ্বলন্ত কলকে

বসিয়ে দিতে হবে মন্দিরের মধ্যে। গড়গড়ার নল সেই ফুটো দিয়ে চলে গেছে, বাইরে গড়গড়ার মাথায় কলকে চাপাতে হবে। নিখুঁত আয়োজন, সাচ্চা দরবারের অধিপতি সারারাত জেগে থাকেন, তামাক টানেন, মাঝে মাঝে গাঁজা। সাচ্চা দরবারের দাতব্য চিকিৎসালয় নিষুতি রাতে খোলা থাকে। দিনের বেলা বন্ধ, দিনের বেলা রাজার রাজা ঘুমিয়ে থাকেন। হাজার হাজার কলসী গঙ্গাজল ঢালা হয় মাথায় তবু সেই কালঘুম ভাঙে না। রাতে ঘুমোতে পারেন না, নাটমন্দিরে যারা ধরনায় পড়ে আছে মাঝে মাঝে তাদের কারও মুখ থেকে ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা যায়—বাবা গো দয়া কর। হয়ত কারও চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে নামে। বাস, ওতেই সন্তুষ্ট। হাজার হাজার কলসী গঙ্গাজল মণ মণ দুধ যা করতে পারে না দু' ফোঁটা অশ্রু তা পারে। তন্দ্রা ছুটে যায় ভোলানাথের, ছুটে গিয়ে ওষুধ দেন। রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীরা ঘরে ফিরে যায়।

জীবনের বেশীর ভাগ রাত পার্বতীশঙ্কর বাবার দরজায় বসে কাটিয়েছেন। রাতের পালা ওঁদের। পার্বতীশঙ্করের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ সাতপুরুষ ঐ রাতের পালা করছেন ওঁরা। বহু কাণ্ড ঘটতে দেখেছেন নিষুতি রাতে সাচ্চা দরবারে। মরণাপন্ন রুগীকে উঠে হেঁটে চলে যেতে দেখেছেন। মন্দিরের পেছনে জল যাবার জন্যে ছোট্ট একটু গর্ত আছে, গর্তর মুখে বসে আছে একটা কঙ্কালসার মানুষ,

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গর্তটার দিকে। আদেশ হয়েছে বাবার, আমার চরণামৃত যাবার গর্ত দিয়ে যা বেরুবে ধরবি, তাহলেই তোর রাজযক্ষ্মা সেরে যাবে। বেরুল একটা কাল-কেউটে, লোকটা ধরে ফেললে ছু'হাতে। লেজ দিয়ে তার ছু'হাত পেঁচিয়ে বুকের ওপর ছোবলাতে লাগল সাপটা। গোটা পাঁচ-ছয় ছোবল মারতেই লোকটা ঢলে পড়ল। কাল-কেউটে লেজের প্যাঁচ খুলে সেই নর্দমা দিয়েই মন্দিরের ভেতর চলে গেল।

ভোরবেলা বাবার দরজা খোলা হল, শুরু হল জল ঢালা বাবার মাথায়। মন্দিরের পেছনে পড়ে রইল লোকটা একভাবে। মরে গেছে না বেঁচে আছে কেউ দেখতেও গেল না। সন্ধ্যাবেলা উঠে বসল সে, সারাটা দিন ঘুমিয়ে ছিল যেন। ছুধপুকুরে স্নান করে বাবার পুজো দিয়ে ঘরে ফিরে গেল। রাজযক্ষ্মা উধাও, কঙ্কালসার শরীর থেকে কেমন যেন একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি বেরুচ্ছে।

একটা ছুটো নয়, শত শত আজগুবী কাণ্ডকারখানার সাক্ষী পার্বতীশঙ্কর। তাই সহজে উনি চমকান না।

সেই রাতে কিন্তু চমকে উঠলেন। একবার নয়, ছু'ছুবার চমকে উঠলেন। প্রথমবার চমকালেন বোমার আওয়াজে। বোমা নয়, কামান দাগছে যেন। ঘন ঘন কয়েকবার বোমার আওয়াজ হল। উঠে দাঁড়ালেন পার্বতীশঙ্কর, কোথায় ফাটছে বোমাগুলো আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন। ধরনায়

পড়েছিল যারা তাদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে বসল। সাচ্চা দরবার পাহারা দেবার জন্যে কয়েকজন দারোয়ান থাকে রাতে, তারা সচকিত হয়ে উঠল। তারপর শোনা গেল গুলির আওয়াজ, বেশ কয়েকবার গুলি ছোঁড়া হল। অনেক দূরে রেল লাইনের ওপার থেকে ভেসে এল যেন বোমা আর গুলির শব্দ। কয়েকটা কোঁচ পড়ল পার্বতীশঙ্করের কপালে। কোথায় কি হচ্ছে?

নড়বার উপায় নেই। ভোলে বোমের দরজায় যে বসে থাকবে রাত্রে সে কোনও কারণেই স্থানত্যাগ করবে না। স্বয়ং বাবার হুকুম।

বসে পড়লেন আবার পার্বতীশঙ্কর। আর এক কলকে তামাক সেজে গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে ছোট্ট পাখাখানি দিয়ে কলকেয় হাওয়া দিতে লাগলেন। যতক্ষণ না সব কখানা টিকে লাল হয়ে উঠবে বাতাস দিতে হবে। উৎকৃষ্ট অম্বরী তামাকের সৌগন্ধে সাচ্চা দরবার বোঝাই হয়ে যাবে যখন তখন বুঝতে হবে ভোলানাথ তামাক সেবন করে তৃপ্ত হয়েছেন।

পার্বতীশঙ্কর জপ শুরু করলেন—"দুঃখহারিণী বিশ্বজননী মহামায়া ব্রহ্মময়ী কালী।" তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটিমাত্র প্রার্থনা মহাকালের মহাশক্তির চরণে নিবেদিত হল—"মাগো, শান্তি দে, শান্তি দে মা শান্তি দে।"

ভোর হল।

অদ্ভুত কাণ্ড, যারা ভোরের আরতি করবে এসে তারা কেউ এল না। ঠিক সময় বাবার দরজা খুলল না। কি ব্যাপার! রাতের দরোয়ানরা ছুটল। পার্বতীশঙ্কর পাষাণের মত বসে রইলেন।

তারপর একসময় আর একবার তিনি চমকে উঠলেন।

বহু লোক একসঙ্গে উপস্থিত হয়েছে। ভয়ানক গোলমাল হচ্ছে। কে কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

সেই ভিড়ের মাঝখান থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল—"নিয়ে চলুন ওকে পার্বতী ঠাকুরের কাছে। তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। ওর আসল নাম বাঘেখেকো, বাউল হয়েছে বলে নাম এখন রেণুদাস। সবাই আমরা রেণুদাসকে চিনি। নিয়ে যান ঠাকুর মশায়ের সামনে, পার্বতী ঠাকুর নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলবেন না।"

ভিঁড়ের মাঝখান দিয়ে একটা পথ হল নিজে থেকে। খাকী পোশাক পরা হাতে পিস্তল কয়েকজন অফিসার এগিয়ে এলেন। পায়ে কিন্তু কারো জুতো নেই। তাদের পেছনে বাঘেখেকো। বাঘেখেকোর নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। একটা চোখ ফুলে উঠেছে। ঝাঁকড়া চুল প্রায় উধাও। পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে বাঘেখেকোকে। পার্বতী-শঙ্করের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে মুখ তুলে হাসবার চেষ্টা করলে বাঘেখেকো। পার্বতীশঙ্কর দেখলেন, গোটাকতক

দাঁতও গেছে, মুখের ভেতরটা রক্তে লাল হয়ে আছে।

যথেষ্ট সংযত কণ্ঠে এক অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—"একে আপনি চেনেন ঠাকুর মশাই ?"

ঘাড় নাড়লেন পার্বতীশঙ্কর, মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

"আমরা একে নিয়ে চললাম। সাংঘাতিক জীব, যাকে কামড়াবে সে মরবে। তিন-চারজনকে কামড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঢুলে পড়েছে। মনে হয় বাঁচবে না। ভয়ানক বিষাক্ত সাপে কামড়ালে যা হয় তাই। নীল হয়ে গেছে একেবারে। এরকম ভয়ঙ্কর প্রাণীকে তো ছেড়ে রাখা যায় না।" বলে অফিসারটি হেঁট হয়ে বাবার বারান্দার সামনে কপাল ছোঁয়ালেন।

আর একজন অফিসার বললেন—"অপরাধও করেছে সাংঘাতিক ধরনের। মস্ত বড় একটা ক্রিমিন্যাল্‌কে ধরবার জন্যে একটা বাড়ি ঘিরে ফেলেছিলাম আমরা। সেই বাড়ির ছাত থেকে বোমা বর্ষণ শুরু হল। বোমা বর্ষণ থামতেই পড়তে লাগল সাপ। জ্যান্ত সাপ, কেউটে গোখরো চন্দ্রবোড়া, একটা দুটো নয়, অগুনতি সাপ পড়তে লাগল আমাদের মাঝখানে। পড়েই তারা ফণা ধরে তাড়া করলে আমাদের। সেই ফাঁকে ক্রিমিন্যালটা সটকালে একখানা জীপে চেপে। তার সঙ্গে একটা মেয়েমানুষও ছিল। সেই মেয়েমানুষটা গুলি চালাতে লাগল। ইতিমধ্যে এই বাবাজী

কোথা থেকে উদয় হয়ে কামড়াতে শুরু করলেন। এখন আমাদের দেখতে হবে কি মতলবে ইনি বাধা দিলেন সরকারী কাজে। মনে হচ্ছে সাপগুলোও ইনি ছুড়েছিলেন। তার মানে—"

বাধা পড়ল। চতুর্দিকের মানুষ মারমুখো হয়ে উঠল। বাঘেখেকোকে তারা ছিনিয়ে নেবেই।

প্রমাদ গনলেন অফিসাররা। গুলি খরচা করতে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু গুলি ফুরিয়ে যাবার পর? বিশেষতঃ ভোলে বোমের মন্দিরের বারান্দায় গুলি চালানোটা কি ঠিক হবে?

দু' হাত উঁচু করলেন পার্বতীশঙ্কর। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন—"থাম, থাম সবাই, বাবার সামনে কেলেঙ্কারি কোর না। বাবার নামে আমি তোমাদের বলছি চুপ কর।"

নিস্তব্ধ হল চারিদিক। সবাই তাকিয়ে আছে পার্বতী-শঙ্করের মুখপানে।

এগিয়ে গেলেন পার্বতীশঙ্কর বাঘেখেকোর দিকে। ওর মাথার ওপর একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওরা কি বাঁচবে না?"

বাঘেখেকো মুখ তুলে আর একবার হাসবার চেষ্টা করলে। তারপর ঘাড় নাড়লে।

অফিসারদের পানে তাকিয়ে পার্বতীশঙ্কর বললেন— "যদি সেই লোকগুলোকে বাঁচাতে চান এর হাত খুলে দিন।

আমি যাব সঙ্গে। আমার কাছ থেকে এ পালাবে না।"

"পালাবার কথা হচ্ছে না, কিন্তু আবার যদি কাউকে কামড়ায়?" বললেন একজন প্রৌঢ় অফিসার।

"কামড়াবে কেমন করে? দাঁতগুলো সব গেছে।" কে যেন বলে উঠল ভিড়ের ভেতর থেকে।

বাঁধন খোলা হল বাঘেখেকোর। পার্বতীশঙ্কর একটা ঘট নিয়ে মন্দিরের পেছনে গিয়ে এক ঘট স্নানজল নিয়ে এলেন। দুধ-ঘি-মধু মেশানো সেই জল ঢকঢক করে গিলে ফেললে বাঘেখেকো। ওকে জড়িয়ে ধরলেন পার্বতীশঙ্কর। অফিসারদের বললেন—"চলুন যাওয়া যাক। বাবার দয়ায় তারা রক্ষা পাবে। যতক্ষণ তারা সুস্থ হয়ে না উঠবে ততক্ষণ আমরা দু'জন আটক থাকব।"

সাচ্চা দরবার।

ভোলে বোম্ বোম্ ভোলে পার লাগা দো বাবা! সাচ্চা দরবার কী জয়!

লক্ষ যাত্রী জল কাঁধে নিয়ে চোদ্দ ক্রোশ হেঁটে যায় সাচ্চা দরবারে। সেই জল চড়ে ভোলানাথের মাথায়। গঙ্গাধরের পূজা হয় গঙ্গাজলে।

জলই জীবন। জীবন দেবতাকে তুষ্ট করতে হলে জীবন দিয়ে স্নান করাতে হয়।

বাঘেখেকোকে সাচ্চা দরবারে খুঁজে পাবে না কেউ,

রেণুদাসকেও না।

পার্বতীশঙ্কর এখনও আছেন। মাটির তলায় ঘরে বসে জপ করেন—"দুঃখহারিণী বিশ্বজননী মহামায়া ব্রহ্মময়ী কালী।"

আসল সত্যি কি তা জেনেছেন পার্বতীশঙ্কর। কামের চেয়ে বড় শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। যে শক্তির স্পর্শে বাঘেখেকো সোনা হয়ে গেল।

ভবানীশঙ্কর এখনও আক্ষেপ করেন, সময়মত যদি বিয়ে দেওয়া হত বাঘেখেকোর, তা'হলে ছেলেটা নষ্ট হয়ে যেত না।

নষ্ট!

মনে মনে হাসেন পার্বতীশঙ্কর।

মনে মনে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করেন—"কবে এরা খাঁটি সোনার সন্ধান পাবে!"

কাম হল ব্যাধি, ঐ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় সুধাপান। সুধা কথাটার অর্থ অমৃত। অমৃত যদি পান করতে পার অমরত্ব লাভ করবে।

জয়া রেণুদাসকে সেই অমৃত পান করিয়েছে। তাই তো রেণুদাস ব্যাধিমুক্ত হল।

মাটির তলায় ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পান পার্বতীশঙ্কর রেণুদাস গাইছে—

'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না।'

॥ শেষ ॥

এ যাবৎ প্রকাশিত অন্যান্য পকেট বই

আশাপূর্ণা দেবীর
দূরের জানলা

সুমথনাথ ঘোষের
ফাগুন কখনো যাবে না

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নিরালা প্রহর

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
তবু মনে রেখো

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
মালবী-মালঞ্চ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
স্বর্ণচাঁপার দিন

প্রকাশিত পরবর্তী পকেট বইয়ের সম্ভাব্য লেখকবৃন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জরাসন্ধ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রফুল্ল রায়, প্রশান্ত চৌধুরী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বিমল কর, বাণী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্কু মহারাজ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী